সেপ্টেম্বর ২০২৬

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

সাম্প্রয়ী তরঙ্গ মূল্য

জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বিলিয়ন ডলার অবদানের সম্ভাবনা



AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

banglalink grameenphone robi teletalk
ERICSSON HUAWEI NOKIA qvantel

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

নিউজলেটার বর্ষ-১২, সংখ্যা-১

সূচীপত্র

৪ সাশ্রয়ী তরঙ্গ মূল্য: জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বিলিয়ন ডলার অবদানের সম্ভাবনা

৭ বাংলাদেশে জিএসএম মোবাইল সেবা তিন দশকের রূপান্তরের অভিযাত্রা

১০ সংযোগের শক্তি, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির নতুন অধ্যায়, ইয়োহান বুসে

১২ টেকসই টেলিকম ইকোসিস্টেমই বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি, ইয়াসির আজমান

১৬ শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক, লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)

২০ ২০২৬-২৭ অর্থবছর বাজেট: সিম ট্যাক্স প্রত্যাহার বাংলাদেশের ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে সহায়ক হতে পারে, তাইমুর রহমান

২২ সংযোগ বনাম ডিজিটাল ভ্যালু ক্রিয়েশন: টেলিকম খাত এক সন্ধিক্ষণে, সাহেদ আলম

২৪ বাংলাদেশে এরিকসনের ভূমিকা: সংযোগ সক্ষম করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া, আব্দুস সালাম

২৭ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির পথে: ৪.০ জাতীয় ইন্ডাস্ট্রি-এর জন্য এজেন্টিক এআইভিত্তিক ইউজার এক্সপেরিয়েন্স লেয়ার নির্মাণ, মাযহারুল ইসলাম

২৯ ইন্টারনেট এখনো বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি ব্যয়বহুল, নূর মিয়াজী

৩১ কানাডায় নেটওয়ার্ক-সংক্রান্ত সমস্যা একটি সাধারণ বিষয়, বিশেষকরে দুর্গম বা পাহাড়ি এলাকায়, শবনম সায়েমা

৩৩ সদস্যদের কার্যক্রম

সম্পাদনা পরিষদ

লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

তানভীর মোহাম্মদ
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার
রবি আজিয়াটা পিএলসি

মো. গোলাম মোরশেদ
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অফ কমিউনিকেশন
এমটব

সম্পাদকীয়



সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগ পরিমণ্ডলে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। প্রযুক্তি, গ্রাহকদের ব্যবহারের ধরন এবং নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এসবের প্রতিটিই এক দশক আগের চিত্র থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গেছে। এই বিশ্ব-গ্রামের অংশ হিসেবে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয় বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলছে দেশটি।

এই রূপান্তর সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে মোবাইল সেবার অগ্রযাত্রায়। এক সময় যা ছিল নিছক ভয়েস কলের একটি মাধ্যম, তা আজ পরিণত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শহুরে নাগরিক থেকে শুরু করে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সকলের কাছে তথ্যপ্রাপ্তিকে সমানভাবে পৌঁছে দিয়েছে। আজকের নেটওয়ার্কগুলো এমন উচ্চগতির ডেটা স্থানান্তর করতে সক্ষম যা কখনো কখনো ফিক্সড-লাইন সংযোগকেও ছাড়িয়ে যায়, ফলে চলমানতা ও বৈশ্বিক তথ্যভাণ্ডারের নাগাল আজ সত্যিকার অর্থেই মানুষের হাতের মুঠোয়।

প্রযুক্তির এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ব্যবহারের ধরন বদলে দিয়েছে। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ডেটা সহজলভ্য হওয়ায় মোবাইল ব্যবহারকারীদের অভ্যাসও পাল্টে গেছে। মানুষ এখন ক্রমশ ওটিটি সেবার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠছে– মেসেজিং অ্যাপ, ভিডিও-অন-ডিমান্ড, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গেমস, বিনোদন প্ল্যাটফর্ম, সংবাদ, রাইড-শেয়ারিং, এমনকি চিকিৎসা পরামর্শের ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে প্রচলিত টেলিভিশন সেটের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে মোবাইল ফোনে সরাসরি বা লাইভে খেলাধুলা ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান উপভোগ করছে।

তবে মাঠপর্যায়ের এই দ্রুত রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রেগুলেটরি (নিয়ন্ত্রক) পরিবেশ এগোয়নি। বিশ্বের অনেক দেশ এখন শিল্প খাতকে নমনীয় বা ন্যূনতম তদারকি করলেও বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখনও ট্যারিফ, একাধিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক কিংবা দৈনন্দিন কার্যক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণের (মাইক্রো রেগুলেশন) আওতার মধ্যে বিবেচনা করে। এই খাতের অবকাঠামো এখনও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বহুস্তরীয় প্রতিষ্ঠানের বোঝায় জর্জরিত। এই অবস্থা একদিকে যেমন ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে মোবাইল অপারেটরদের সেবার মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি এ বছরই বাংলাদেশে মোবাইল শিল্প তার কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে। একই বছরে অপারেটরদের সামনে রয়েছে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ তিনটি ব্যান্ডে লাইসেন্স ও স্পেকট্রাম নবায়ন। এই মাইলফলকগুলো একত্রে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কারের জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। এখন প্রয়োজন রেগুলেটরি কাঠামোর আধুনিকায়ন, কর ও ভ্যাট ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে আনা এবং সত্যিকার অর্থে ব্যবসা ও বিনিয়োগ, বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা। এ ধরনের পরিবর্তন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে জোরদার করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।

এই প্রেক্ষাপটে কানেকশনের এই সংখ্যায় আমরা মোবাইল লাইসেন্স ও স্পেকট্রাম নবায়ন, কর সংস্কার এবং সাম্প্রতিক নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছি। সঙ্গে রয়েছে এই শিল্পের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার ও গভীর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন। পাশাপাশি তুলে ধরেছি দুজন প্রবাসী বাংলাদেশির মোবাইল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা। তারা বাংলাদেশ ও তাদের বর্তমান প্রবাসস্থলের মধ্যে মোবাইল সেবার মান ও ব্যয়ের তুলনা করেছেন।

আমরা আশা করি, পাঠকবৃন্দ বিশেষত নীতিনির্ধারকরা এই সংখ্যাটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাবেন যার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে মোবাইল শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়া আরও গভীর হবে।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh



বাংলাদেশের টেলিকম খাতের অর্জন অসাধারণ। এই শিল্প লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংযুক্ত করছে, একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা করছে এবং জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলোকে এগিয়ে নিচ্ছে। তবে আমরা অতীতের সাফল্যে সন্তুষ্ট থেকে বসে থাকতে পারি না। সামনের দিনের চ্যালেঞ্জগুলো আরও জটিল। প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে এমন নীতিমালা প্রয়োজন হবে যা একদিকে ভোক্তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে অপারেটরদের আর্থিকভাবে সক্ষম করে তুলবে। এটা করা হলে এই দ্রুত বর্ধনশীল ডিজিটাল অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী অপারেটররা দেশে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারবে।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৬ সালের বাজেটে সরকারের সিম কর প্রত্যাহারকে আমরা স্বাগত জানাই। এই সংস্কার টেলিকম শিল্পের বিস্তারের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি বাধা দূর করবে। সিম কর প্রত্যাহারের ফলে শুধু যে সংযোগবিহীন মানুষদের সংযুক্ত করা সহজ হবে তা নয়, বরং তা নতুন ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল খাতে যুক্ত হওয়ার সামগ্রিক খরচও হ্রাস করবে।

গত প্রায় দুই দশক ধরে টেলিকম শিল্প ও ভোক্তারা এই করের বোঝা বহন করে আসছেন। ফলে এই সময়ে এই খাত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাই সিম কর নিয়ে এই সিদ্ধান্তের ফলে কেবল অপারেটররাই লাভবান হবে এমন চিন্তা করা বাস্তবতা পরিপন্থী। এ ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয় যে, দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশিত এই সিম কর প্রত্যাহার শেষ পর্যন্ত দেশের জন্যই কল্যাণকর হবে, কারণ এটি আমাদের সমাজে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হবে।

আমরা ভোক্তাদের উপর প্রত্যক্ষ করের বোঝা কমানোর পক্ষে জোরালোভাবে সোচ্চার থাকব। একই সঙ্গে এটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্প যেন টিকে থাকে। সেটা হলে মোবাইল শিল্প নেটওয়ার্ক সক্ষমতা, কাভারেজ, মানসম্মত সেবা এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে পারবে। টেকসই শিল্পের পথ তৈরি করতে গেলে ভোক্তাস্বার্থে ছাড় দিতে হবে, ব্যাপারটা এমন না। বরং একটি টেকসই শিল্পকে এমনভাবে বিবেচনা করা উচিৎ যেন তা নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী হয় এবং উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা সকল ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

২০২৬ সালের বাজেটে আরও কিছু কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অস্পষ্টতা দূরীকরণ এবং নিয়ন্ত্রক ফি ও চার্জ থেকে অগ্রিম আয়কর কর্তন প্রত্যাহার। এই শিল্পের সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে তা সমাধানে অর্থবহ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাই। পদক্ষেপগুলো এই খাতকে অধিকতর নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং অব্যাহত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

আমরা জেনে আনন্দিত সরকার ও মোবাইল অপারেটরদের পাশাপাশি মনে করে, এদেশে স্পেকট্রামের মূল্য সাশ্রয়ী নয়। স্পেকট্রামের মূল্য বেশি হওয়ার ফলে সেবা প্রদানের খরচ বৃদ্ধি পায় যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ যদি তার ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে চায় তাহলে দ্রুততার সাথে এবং বিশ্বব্যাপী এর মূল্য নির্ধারণের যে প্রবণতা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে তা বরাদ্দ দেওয়া উচিত। এটা করা হলে তা মানসম্মত ও তথ্য-নির্ভর সেবা সম্প্রসারণে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে।

বাস্তবিক অর্থেই ডিজিটাল জাতি গঠনের জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে কাজ করার পাশাপাশি দ্রুততর সময়ের মধ্যে স্পেকট্রাম বরাদ্দ, স্পেকট্রামের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, যুক্তিসঙ্গত কর ব্যবস্থা এবং রেগুলেটরি স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা এখনও সংযুক্ত নয় তাদের সংযুক্ত করা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ করা এবং দেশের ডিজিটাল অবকাঠামোর যথাযথ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে মোবাইল খাত সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যবসায়ী মহল ও নাগরিকদের সঙ্গে কাজ করতে সর্বদা প্রস্তুত।

জিয়াদ সাতারা
প্রেসিডেন্ট, এমটব

এমটব বোর্ড

জিয়াদ সাতারা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা পিএলসি

ইয়োহান বুসে
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

নুরুল মাবুদ চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব
এমটব

এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।



সাশ্রয়ী তরঙ্গ মূল্য

জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বিলিয়ন ডলার অবদানের সম্ভাবনা

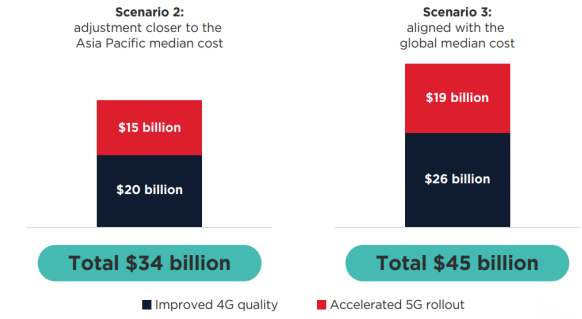
এমটব প্রতিবেদন

মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল অভিযাত্রাকে আরও গতিশীল করার একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে অপারেটরদের যখন স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেওয়া হবে তখন এই সুযোগের সৃষ্টি হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের অপারেটরদের স্পেকট্রাম বাবদ যে ফি প্রদান করতে হয় তা তাদের গড় আয়ের ১৬ শতাংশ। অথচ বৈশ্বিক বিচারে এই হার এর অর্ধেক বা ৮ শতাংশ। বাংলাদেশেও যদি স্পেকট্রাম বরাদ্দ ফি বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় তাহলে তা অর্থনীতিতে ব্যাপক ও শক্তিশালী বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলতে পারে। তা করা হলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অতিরিক্ত প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে।

স্পেকট্রাম বরাদ্দ ফি সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করে তা বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হলে অপারেটররা নেটওয়ার্ক উন্নয়নে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে। এতে ফোরজি নেটওয়ার্কের গতি প্রায় ২২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফাইভজি সেবা দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিএসএমএ ইন্টেলিজেন্স প্রকাশিত এক গবেষণায় এসব বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জিএসএমএ এর গবেষণা বলছে, তুলনামূলক কম আয় এবং উচ্চ স্পেকট্রাম ও রেগুলেটরি ব্যয়ের কারণে বাংলাদেশের মোবাইল বাজারে একটি চ্যালেঞ্জিং বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই ব্যয় কমানো গেলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং উন্নত সংযোগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। উচ্চ স্পেকট্রাম মূল্য ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করছে এবং সম্ভাব্য জিডিপি অবদানের সুযোগও কমিয়ে দিচ্ছে। গবেষণাটি স্পেকট্রাম সংস্কারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা

Economic benefits of lower spectrum costs, relative to the reference scenario



Note: Totals may not add up due to rounding.
Source: GSMA Intelligence

বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল অর্থনীতি এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সহায়ক হতে পারে।

জিএসএমএ ইন্টেলিজেন্সের মতে, বাংলাদেশের ট্রিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল অর্থনীতির পথে অগ্রযাত্রা নির্ভর করছে

সাশ্রয়ী ও মানসম্মত মোবাইল সংযোগের উপর। তাই মোবাইল নেটওয়ার্কের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে স্পেকট্রাম মূল্য কাঠামোয় সংস্কার আনা অত্যন্ত জরুরি। গত এক দশকে মোবাইল অপারেটররা বাংলাদেশে ফোরজি কাভারেজ প্রায় ৯৯ শতাংশ জনসংখ্যার মধ্যে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের হার এখনো তুলনামূলকভাবে কম। মাত্র ৪৬% মানুষ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং প্রতি সংযোগে গড় মাসিক ডেটা ব্যবহার মাত্র ৫ জিবি।

"বাংলাদেশে স্পেকট্রাম মূল্য নির্ধারণের প্রভাব" শীর্ষক এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এর একটি বড় কারণ হলো ডিভাইস ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা। এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যবহারকারী ফিচার ফোন বা বেসিক ফোন ব্যবহার করেন যেসব ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না। তবে ফোরজি ও ফাইভজি সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হবে। ক্রমবর্ধমান ডেটা চাহিদা পূরণে নেটওয়ার্ককে আরও প্রস্তুত হতে হবে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এই গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্কগুলো তুলনামূলকভাবে কম স্পেকট্রাম নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ স্পেকট্রাম ব্যয়ের অনুপাত অপারেটরদের আয়ের তুলনায় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ। বর্তমানে অপারেটররা মোট ৫০০ মেগাহার্টজের কিছু বেশি স্পেকট্রাম ব্যবহার করছে যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অনেক দেশের তুলনায় কম। যদিও

The spectrum-cost-to-revenue ratio in Bangladesh exceeds the regional and global averages

Spectrum cost as a share of operators' recurring revenue



Note: The figure for Bangladesh is based on data for the three largest operators, excluding Teletalk. Asia Pacific and global medians are based on countries where data was available.
Source: GSMA Intelligence estimates based on GSMA Intelligence data

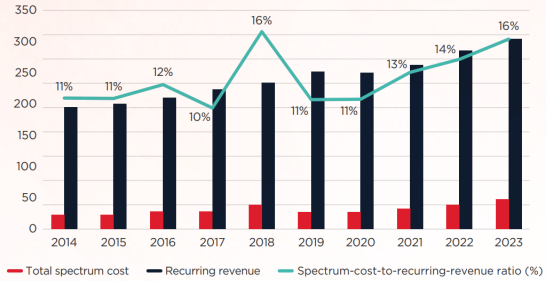
সম্প্রতি ২.৩ ও ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে কিছু নতুন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদে ৯০০ মেগাহার্টজ, ১৮০০ মেগাহার্টজ এবং ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের লাইসেন্স নবায়ন, পাশাপাশি ৭০০ মেগাহার্টজ ও ৩৫০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে নতুন বরাদ্দ বর্ধিত ডেটা চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরবর্তীতে সরকার নিলামের মাধ্যমে ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড বরাদ্দ দিলেও উচ্চ মূল্যের কারণে কেবল শীর্ষ অপারেটর গ্রামীণফোন এটি ক্রয় করে। বাজারের অন্যান্য অংশীদাররা উচ্চমূল্যের কারণে তা বরাদ্দ নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য, বাংলালিংক, গ্রামীণফোন, রবি আজিয়াটা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিটকসহ বাংলাদেশের চারটি মোবাইল অপারেটরকেই ২০২৬ সালে তাদের লাইসেন্স ও বরাদ্দকৃত তিন ব্যান্ডের স্পেকট্রাম নবায়ন করতে হবে। আগামী বছরগুলোতে সরকারের নির্ধারিত স্পেকট্রাম মূল্য মোবাইল টেলিকম সেবার উপর

Spectrum costs in Bangladesh have increased significantly in recent years

Total spectrum cost and recurring revenue (BDT, billion)



Note: Based on data for the three largest operators in Bangladesh, excluding Teletalk.
Source: GSMA Intelligence estimates based on GSMA Intelligence data

উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

নিম্ন আয় বা আরপু (গ্রাহকপ্রতি মাসিক গড় আয়) এবং তুলনামূলক কম রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সত্ত্বেও বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের উপর স্পেকট্রাম খরচ ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। জিএসএমএ-এর গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট স্পেকট্রাম ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্পেকট্রাম খরচ ও আয়ের অনুপাত ২০১৪ সালে যা ছিল ১১ শতাংশ তা ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬ শতাংশে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে অতিরিক্ত স্পেকট্রাম অধিগ্রহণ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং স্পেকট্রামের সীমিত প্রাপ্যতা। বর্তমানে বাংলাদেশের স্পেকট্রাম খরচ ও আয়ের অনুপাত বা কস্ট-টু-রেভিনিউ রেশিও (১৫.৭ শতাংশ) এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মানের (১০.৪ শতাংশ) থেকেও বেশি এবং বৈশ্বিক মানের (৭.৭ শতাংশ) প্রায় দ্বিগুণ।

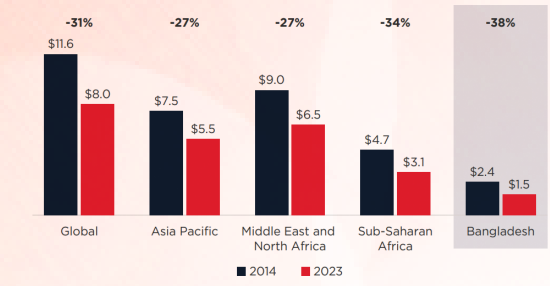
এর পাশাপাশি রাজস্ব-ভিত্তিক অতিরিক্ত কর ও ফি, যেমন নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে ৫.৫ শতাংশ রাজস্ব-শেয়ারিং ব্যবস্থা এবং ১ শতাংশ ইউনিভার্সাল সার্ভিস ফান্ড (বাংলাদেশে সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড) ২০২৩ সালে খাতটির মোট করভারকে অপারেটরদের আয়ের ২২.২ শতাংশে উন্নীত করেছে। সব মিলিয়ে, ভোক্তা পর্যায়ের করসহ মোট করের বোঝা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৫%, যেখানে বৈশ্বিকভাবে এই গড় মাত্র ২২ শতাংশ। গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, এই উচ্চ ব্যয় কাঠামো বিনিয়োগ এবং নতুন প্রযুক্তি বিস্তারের গতি কমিয়ে দিতে পারে এবং দেশের ডিজিটাল অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে।

স্পেকট্রামের মোট ব্যয় কমানো হলে বাংলাদেশের নেটওয়ার্কের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে পারে এবং এটি দেশের অর্থনীতিতে কয়েক বিলিয়ন ডলারের প্রবৃদ্ধি আনতে সক্ষম হবে।

গবেষণা অনুযায়ী, উচ্চ স্পেকট্রাম খরচ সাধারণত গ্রাহকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যেমন নেটওয়ার্ক কাভারেজ ও ইন্টারনেট গতির সীমাবদ্ধতা। বিপরীত দিকে, স্পেকট্রাম ব্যয় কম হলে অপারেটররা আরও বেশি বিনিয়োগ করতে পারে, যার ফলে সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

গবেষণায় ২০৩৫ সাল পর্যন্ত নেটওয়ার্কের গুণগত মান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করে তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতি (scenario) উপস্থাপন করা হয়েছে।

Revenue per connection declined globally between 2014 and 2023
Average monthly revenue per connection (inflation-adjusted)



Note: The figures for Bangladesh are based on data for the three largest operators, excluding Teletalk.
Source: GSMA Intelligence estimates based on GSMA Intelligence data

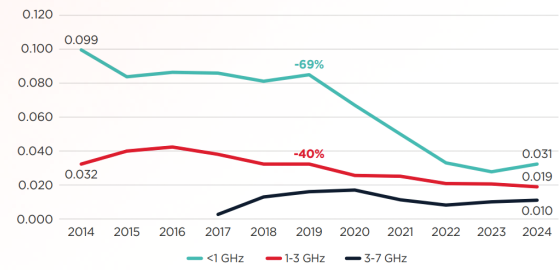
পরিস্থিতি ১ (বর্তমান পরিস্থিতি)

বর্তমান ও অতীতের মূল্য কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলে ২০৩৫ সালে স্পেকট্রাম খরচ অপারেটরদের আয়ের প্রায় ২১ শতাংশে পৌঁছাবে। এতে কিছু স্পেকট্রাম অব্যবহৃত বা ফেরত যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে, ফোরজি উন্নয়ন সীমিত হবে এবং ফাইভজি সম্প্রসারণ বিলম্বিত হয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে মাত্র ৮৬ শতাংশ জনসংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছাবে।

পরিস্থিতি ২ (৫০ শতাংশ মূল্য হ্রাস)

ইউনিট মূল্য ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হলে স্পেকট্রাম খরচ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যম মানের কাছাকাছি (প্রায় ১২ শতাংশ) নেমে আসবে। এর ফলে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ত্বরান্বিত

Spectrum prices are adjusting down globally
Average spectrum price per MHz ($2023 PPP/MHz/year/population)



Source: GSMA Intelligence estimates based on GSMA Intelligence data (global sample, three-year rolling average after removal of outliers). WACC-adjusted figures.

হয়ে ফোরজি গতি প্রায় ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ফাইভজি কভারেজ ৯৯ শতাংশ জনসংখ্যায় পৌঁছাতে পারে। এতে মোট জিডিপিতে প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলারের প্রবৃদ্ধি হতে পারে, যার মধ্যে ২০ বিলিয়ন ডলার আসবে ফোরজি উন্নয়ন থেকে এবং ১৫ বিলিয়ন ডলার ফাইভজির দ্রুত সম্প্রসারণ থেকে।

পরিস্থিতি ৩ (৭৫ শতাংশ মূল্য হ্রাস)

স্পেকট্রাম খরচ যদি বৈশ্বিক মধ্যম মান (প্রায় ৮ শতাংশ) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়, তাহলে নেটওয়ার্কের আরও উন্নতি সম্ভব হবে। এতে ফোরজি গতি প্রায় ২২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং ফাইভজি দ্রুত সম্প্রসারিত হবে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মোট প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলারের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে যার মধ্যে ২৬ বিলিয়ন ডলার ফোরজি উন্নয়ন থেকে এবং ১৯ বিলিয়ন ডলার ফাইভজি সম্প্রসারণ থেকে আসবে।

জিএসএমএ-এর মতে, লাইসেন্স নবায়নের সময় যদি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তাহলে কোনো স্পেকট্রাম বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতীতে যে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল, সেটিকে নতুন মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। গবেষণায় এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

- নবায়নের সময় স্পেকট্রামের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যেন তা বাংলাদেশের বাস্তব অর্থনৈতিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে। এতে অপারেটররা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে এবং রেগুলেটরি ব্যয়ের চাপও কিছুটা হ্রাস পাবে।
- যদি নবায়ন ফি থেকে শুধু সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কে বিবেচনা করা হয় তাহলে অপারেটরদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়বে। এর ফলে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ধীর হয়ে যেতে পারে বা দেরি হতে পারে। অন্যদিকে, স্পেকট্রামের খরচ কম হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং নেটওয়ার্ক দ্রুত ও বিস্তৃতভাবে উন্নত করা সম্ভব হয়। ফলে তা ব্যবহারকারীদের জন্যও মঙ্গলজনক।
- স্পেকট্রামের দাম বেশি হলে নবায়নের সময় অপারেটররা বরাদ্দকৃত স্পেকট্রামের পুরোটা না-ও নিতে পারে বা ফেরত দিতে পারে। এর প্রভাব নেতিবাচক। কারণ স্বল্প স্পেকট্রামের অর্থ দুর্বল নেটওয়ার্ক এবং সেবার মান নিম্নগামী করে তুলবে।
- লাইসেন্স নবায়নের সময় এ সংক্রান্ত নীতির শর্তসমূহ আধুনিক করার সুযোগ থাকে। যেমন, মূল্য স্থানীয় মুদ্রায় নির্ধারণ করা, যাতে ডলার বা বিনিময় হারজনিত ঝুঁকি না থাকে; দীর্ঘমেয়াদি লাইসেন্স দেওয়া, যাতে বিনিয়োগে স্থায়িত্ব আসে; এবং কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের সুযোগ রাখা, কারণ স্পেকট্রামে বিনিয়োগের লাভ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে আসে।
- স্পেকট্রাম মোবাইল সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও বাংলাদেশে এর ওপর অতিরিক্ত ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। স্পেকট্রাম ফি এবং ভ্যাট, দুটোই সরকারের আয়ের উৎস হলেও স্পেকট্রাম ফি-কে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দিলে ভবিষ্যতে ভ্যাটের হার পরিবর্তনের কারণে কিস্তিভিত্তিক পরিশোধে অপ্রত্যাশিত খরচ পরিবর্তনের ঝুঁকি কমবে। এতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা আরও স্থিতিশীল হবে।



বাংলাদেশে জিএসএম মোবাইল সেবা তিন দশকের রূপান্তরের অভিযাত্রা

এমটব প্রতিবেদন

বাংলাদেশে জিএসএম মোবাইল লাইসেন্স প্রদানের তিন দশক পেরিয়ে গেছে। প্রত্যাশা ছিল এক সময়ের একচেটিয়া বাজার পরিস্থিতি থেকে ওয়্যারলেস সেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পূর্বের সেবা ছিল প্রধানত শহরকেন্দ্রিক যা সারাদেশে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করতে পারেনি। তার হ্যান্ডসেট বিকল্পও ছিল খুব সীমিত। অন্যদিকে নতুন জিএসএম সেবা এসেছিল প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে। ফলে জিএসএম অপারেটরগুলোর মোবাইল ভয়েস সেবা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের টেলিকমিউনিকেশনের লাইফলাইনে পরিণত হয়। ভয়েসের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন সেবা নিয়ে তা হাজির হয় এবং ক্রমেই যুক্ত হয় দ্রুত গতির ইন্টারনেট। দেশের প্রতি ১০ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯ জনই এখন মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশে জিএসএম প্রযুক্তির যাত্রা কেবল প্রযুক্তিগত উত্তরণের গল্প নয়। টুজি থেকে ৫জি বরং এক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর। এটি এমন এক আখ্যান, যেখানে সংযোগ দরিদ্রকে ক্ষমতায়িত করেছে, দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক খাতকে ডিজিটালাইজ করেছে, বিলিয়ন ডলারের মোবাইল আর্থিক সেবা শিল্পের জন্ম দিয়েছে এবং গ্রাম ও শহর উভয়ের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও রাষ্ট্রায়ত্ত তারযুক্ত বা ফিক্সড টেলিফোনি (বিটিটিবি) জনগণের জন্য একমাত্র মাধ্যম ছিল এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। পরে বেতার ব্যবস্থার ব্যাপক বিবর্তন ঘটে এবং একসময় কেবল সামরিক সেবার জন্য ব্যবহৃত স্পেকট্রাম বা বেতার তরঙ্গ জনসাধারণের যোগাযোগ সেবার প্রধান উপাদানে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিএসএম প্রযুক্তিই ছিল সর্বোত্তম মাধ্যম যা বিশ্বব্যাপী খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৯৩ সালে দেশে সিটিসেল সেবা প্রদান করা শুরু করে। তবে, সিটিসেল সিডিএমএ (কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে। বলাই বাহুল্য, সিটিসেল প্রমাণ করেছিল যে মোবিলিটির জন্য একটি বাজার রয়েছে কিন্তু উচ্চ মূল্য এবং প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতার কারণে এটি সাধারণ জনগণের কাছে সেভাবে পৌঁছাতে পারেনি। লাখ টাকা মূল্যের হ্যান্ডসেট এবং মিনিটে প্রায় ২৫ টাকা কল রেটের কারণে এটি ছিল কেবল শহুরে অভিজাতদের জন্য এক ধরনের বিলাসিতা। পরে ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে একচেটিয়া বাজার ভাঙতে তিনটি জিএসএম লাইসেন্স প্রদান করা হয় যা দীর্ঘদিন ধরে বাংলালিংক, গ্রামীণফোন ও রবি

ব্র্যান্ড নামে সেবা প্রদান করে আসছে।

দিন যত এগিয়েছে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে মোবাইল সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন সেবা। বাংলাদেশও পিছিয়ে ছিল না। নিচে তার কিছু কিছু তুলে ধরা হলো-

ভয়েস ও এসএমএস

শুরুর দিকে মোবাইল অপারেটরগুলো শুধু ভয়েসসেবা প্রদান করলেও দ্রুতই এর সংগে ক্ষুদ্র বার্তা বা এসএমএস যুক্ত হয়। অপরদিকে অপারেটরগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার প্রভাবে কল রেট দ্রুতই নেমে আসে। এখানে উল্লেখ্য যে পৃথিবীর যে দেশগুলোতে মোবাইল কল রেট সবচেয়ে কম বা একদম তলানিতে বাংলাদেশ তার অন্যতম।
প্রতিযোগিতামূলক বাজার, বিপণন নীতি এবং হ্যান্ডসেটের বৈচিত্র্যের কারণে কয়েক বছরের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা ৫ কোটিতে উন্নীত হয় যা এখন প্রায় ১৯ কোটি।

থ্রিজি, ফোরজি ও ফাইভজি

সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ইন্টারনেট ব্যবহারে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে ছিল। ফিক্সড ইন্টারনেটের সেবা দুষ্প্রাপ্য ছিল। তবে স্মার্টফোন আর মোবাইল ইন্টারনেট দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কারণে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট বলতে মোবাইল ইন্টারনেটকেই একরকম বোঝানো হয়--প্রতি ১০ জন্য গ্রাহকের মধ্যে ৯ জনই মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। শুরুর দিকে ওয়ারলেস প্রযুক্তিতে এজ এবং জিপিআরএস চালু হয় এবং ক্রমেই থ্রিজি এবং ফোরজি বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়। থ্রিজি ২০১৩ সালে এবং ফোরজি চালু হয় ২০১৮ সালে। ফোরজি ডেটার জন্য গেমচেঞ্জার ছিল, যা হাই-স্পিড ভিডিও স্ট্রিমিং এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) যেমন বিকাশ, নগদ, ও রকেটের বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। সম্প্রতি দুইটি অপারেটর গ্রামীণফোন ও রবি আজিয়াটা কিছু কিছু এলাকায় ফাইভজি চালু করেছে।

স্যাটেলাইট ফোন সেবা

খুব সম্প্রতি বাংলালিংক তাদের নতুন স্যাটেলাইট ফোন সেবার ঘোষণা দিয়েছে যা গ্রাহকদের প্রাথমিক মোবাইল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে স্টারলিংক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে, বিশেষকরে, দুর্গম বা উপকূলীয় এলাকাগুলোতে যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক তুলনামূলক দুর্বল।

বাংলাদেশে গড় মোবাইল ডেটার দাম বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা বাজারগুলোর অন্যতম। যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান কেবলকোডটইউকে অনুসারে, এই অবস্থান বিশ্বে আমরা ১২তম সর্বনিম্ন। এক গিগাবাইট গড় মোবাইল ডেটার দাম .২৩ মার্কিন ডলার বা ৩০ টাকার কম। অনুরূপভাবে, ভয়েস কলের দামও সর্বনিম্ন পর্যায়ে-- সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন (ফ্লোর ও সিলিং) যথাক্রমে ৪৫ পয়সা ও ২.০০ টাকা। এর সঙ্গে ভ্যাট-ট্যাক্স যুক্ত হয়।

প্রথম নবায়ন ও স্পেকট্রাম বরাদ্দ

১৫ বছরের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-এর ২০১০ সালের দিকে অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করে যা পরের বছর স্পেকট্রাম বরাদ্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে, সে সময়ে অপারেটরদের অতি উচ্চ মূল্যে তরঙ্গ বরাদ্দ নিতে হয়। মূলতঃ ৯০০ এবং ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রদান করা হয় অপারেটরদের। তাছাড়া তা শুধুমাত্র ভয়েস সেবার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় বলে মাত্র দুই বছর পরেই অপারেটরদের ২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে থ্রিজির জন্য আবারও তরঙ্গ বরাদ্দ নিতে হয়। বলা বাহুল্য, এবারও অত্যন্ত চড়া মূল্যে তা বরাদ্দ নিতে হয়।

ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের অপারেটরদের এই অঞ্চলের দেশ বা সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় বেশি মূল্যে স্পেকট্রাম বরাদ্দ নিতে হয়। এর প্রভাব সার্বিকভাবে সেবার উপর পড়ে এবং মানসম্মত সেবা প্রদান দুরহ হয়ে পড়ে। একদিকে উচ্চমূল্যে তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়ে আগাম অর্থ পরিশোধ করতে হয় অন্যদিকে নেটওয়ার্ক বিস্তার করার জন্য যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়ার ক্রয় করতে হয়। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় উচ্চ হারে কর। ফলে বাংলাদেশে অপারেটরদের জন্য নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসা খুব কঠিন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশে ২০১৩ সালে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হওয়ার পর অপারেটররা ৩০ থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছিল, কিন্তু এর বিপরীতে আয় ১০ হাজার কোটি টাকার মতো হয়েছিল বলে জানা যায়। অথচ, স্পেকট্রামের মূল্য যদি যৌক্তিক হতো তাহলে অপারেটররা নেটওয়ার্ক বিস্তারে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারতো। আমরা জানি, ইউরোপে নব্বইয়ের দশকে স্পেকট্রাম বাবলের কারণে কীভাবে অপারেটর এবং টেলিকম যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ব্যবসা তুলে নিতে বাধ্য হয়। তবে, কিছু কিছু ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকালে সরকার তথা বিটিআরসি ধার্য করা মূল্য তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল এবং তা কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিল।

২০২৬ সালে দ্বিতীয় স্পেকট্রাম নবায়ন

এ বছর সরকার এবং মোবাইল অপারেটররা দ্বিতীয়বারের মতো তাদের লাইসেন্স নবায়ন করতে যাচ্ছে। লাইসেন্স নবায়নের সাথে সাথে ৯০০ মেগাহার্টজ, ১৮০০ মেগাহার্টজ

অপারেটররা তাদের তাদের মোট আয়ের প্রায় ৫৬% সরকারকে কর, ভ্যাট এবং রাজস্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রদান করে। সরকারি ফি এতটাই বেশি যে শীর্ষ তিন অপারেটর গত বছর তাদের মোট ৩৩,০০০ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে সরকারি কোষাগারে ২২,০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এসব কারণেই এমটবসহ মোবাইল শিল্প সরকারের কাছে কর ও তরঙ্গমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং স্পেকট্রামের উপর থেকে ভ্যাট বাতিল করার অনুরোধ করে আসছে।

এবং ২১০০ মেগাহার্টজ-এর তরঙ্গ নবায়ন করতে হবে। ফলে অপারেটরদের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এই নিবন্ধের পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থনীতি বা বাজারগুলোর তুলনায় এদেশে স্পেকট্রামের দাম অত্যধিক বেশি। এটা অপারেটরদের জন্য বিরাট আর্থিক চাপ।

স্পেকট্রামের মূল্য এবং উৎকৃষ্ট সেবা এই দুটোর সম্পর্ক একদম বিপরীত। অর্থাৎ মূল্য যত বেশি বৃদ্ধি করা হবে মানসম্মত সেবার প্রদানের সক্ষমতার উপর তা তত বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফলে স্পেকট্রামের ধার্যকৃত মূল্যই বলে দেবে সরকার আসলে কী চায়– আগাম অর্থ নাকি মানসম্মত সেবা বা দেশব্যাপী উন্নততর ডিজিটাল সেবা! একেই তো দেশে মোবাইল খাত করভারে জর্জরিত এবং বিনিয়োগের বিপরীতে আয় সন্তোষজনক নয়, গ্রাহকপ্রতি আয় অত্যন্ত কম; তার উপর নিয়মিতভাবে তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য বিপুল অর্থ সার্বিকভাবে সেবার উপর প্রভাব ফেলে। অপারেটররা তাদের মোট আয়ের প্রায় ৫৬% সরকারকে কর, ভ্যাট এবং রাজস্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রদান করে। সরকারি ফি এতটাই বেশি যে শীর্ষ তিন অপারেটর গত বছর তাদের মোট ৩৩,০০০ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে সরকারি কোষাগারে ২২,০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এসব কারণেই এমটবসহ মোবাইল শিল্প সরকারের কাছে কর ও তরঙ্গমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং স্পেকট্রামের উপর থেকে ভ্যাট বাতিল করার অনুরোধ করে আসছে।

তরঙ্গ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তা যতক্ষণ নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা না হচ্ছে ততক্ষণ তার কোন ভ্যালু বা মূল্য নেই। অপারেটরদের কাছে একবার তরঙ্গ বরাদ্দের সময় ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে এবং পুনরায় তাদের আয় থেকে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। এতে দ্বৈত কর হয়ে যায়। আর কোন দেশে এমন ব্যবস্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

সেবার গুণমান, কভারেজ ও ট্যারিফ

দেশের মোবাইল ক্যারিয়াররা অত্যাধুনিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ১০০ শতাংশ জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক এলাকা কভার করেছে। এমনকি প্রত্যন্ত চর এবং উপকূলীয় এলাকাতেও নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে। অপারেটররা নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবার জন্য পুরো নেটওয়ার্ক ফোরজি সাইট দিয়ে সংযুক্ত করেছে।

বলাইবাহুল্য, গত আড়াই-তিন দশকে পুরো দেশে মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটেছে জালের মতো এবং ডেটার গতি, কল ড্রপ রেট ইত্যাদি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত মানের মধ্যে রয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কের গড় ডাউনলোড এখন ৪০ এমবিপিএস ছুঁই ছুঁই, আপলোড গতি ১২ এমবিপিএসের বেশি এবং কল ড্রপ অর্ধ শতাংশেরও কম। তবে, একটা বিষয় মেনে নিতেই হবে যে ওয়ারেলেস সিস্টেমের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-- যেমন আবহাওয়া খারাপ হলে, নিম্নমানের হ্যান্ডসেট হলে, দ্রুতগতির বাহনে চলার সময়, লিফটের ভিতর কিংবা উঁচু ভবনে অবস্থানকালসহ আরও কিছু কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গ্রাহকেরা কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে গড় মোবাইল ডেটার দাম বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা বাজারগুলোর অন্যতম। যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান কেবলকোডটইউকে অনুসারে, এই অবস্থান বিশ্বে আমরা ১২তম সর্বনিম্ন। এক গিগাবাইট গড় মোবাইল ডেটার দাম ০.২৩ মার্কিন ডলার বা ৩০ টাকার কম। অনুরূপভাবে, ভয়েস কলের দামও সর্বনিম্ন পর্যায়ে-- সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন (ফ্লোর ও সিলিং) যথাক্রমে ৪৫ পয়সা ও ২.০০ টাকা। এর সঙ্গে ভ্যাট-ট্যাক্স যুক্ত হয়।

চ্যালেঞ্জ

কর কাঠামো: দেশে মানসম্মত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কর কাঠামো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হয়। রাজস্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা মোবাইল ব্যবহারকে বিলাসিতা বলে মনে করে, ফলে মোবাইল সেবার (ভয়েজ ও ইন্টারনেট) উপর ৩৯ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও মুসক আদায় করে। এর সংগে যুক্ত হয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার ফি। অপারেটরদের ১০০ টাকা আয়ের মধ্যে প্রায় ৫৬ টাকাই সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়।

ব্যবসার উচ্চ ব্যয়: বাংলাদেশে স্পেকট্রাম থেকে আয় অনুপাতে ১৬%, যেখানে এশিয়া-প্যাসিফিকের দেশগুলোতে এই হার ১০.৪%। অপারেটরদের তরঙ্গের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভ্যাট। আবার যুক্ত হয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যয়। মোবাইল এমন একটি খাত যা প্রতিনিয়ত উন্নয়নের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় পর পর অবকাঠামো পুনরায় স্থাপন করার প্রয়োজন হয়। ফলে নতুন প্রযুক্তি বা নতুন করে স্পেকট্রাম বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথেই নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যার স্থাপন করতে হয়। ফলে সার্বিকভাবে ব্যবসায় ব্যয় বেড়ে যায়।

জটিল ইকোসিস্টেম: বাংলাদেশের টেলিকম বাজার অত্যন্ত জটিল। অর্থাৎ অনেক পথ ঘুরে গ্রাহকের কাছে একটি সেবা পৌঁছাতে হয়। এটা সেবার মান ও ব্যবসার ব্যয়কে প্রভাবিত করে। অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্ক প্রসারণের জন্য ফাইবার স্থাপন বা টাওয়ার স্থাপনও করতে পারে না।

নিম্ন আয়: একদিকে যেমন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার অন্যদিকে সরকারের নির্দেশনা এবং চাপে মোবাইল সেবার দাম অনেক কম। জিএসএমএ-র মতে, অপারেটরদের গ্রাহকপ্রতি গড় মাসিক আয় বা আরপু ১.১৫ মার্কিন ডলার।

এগিয়ে যাওয়ার পথ

বাংলাদেশ সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে। এমতাবস্থায়, দেশে ডিজিটাল রূপান্তর ঘটাতে হলে মোবাইল সেবাকে দেশের সর্বস্তরে যথাযথভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্য বেশকিছু সুপারিশ করা যায় --

কর যৌক্তিককরণ: সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা ও নিয়ন্ত্রকদের সাথে ক্রমাগত আলোচনার মাধ্যমে মোবাইল সেবার ওপর করকে যৌক্তিক করতে হবে। স্পেকট্রামের দাম কমানো, স্পেকট্রামের উপর ভ্যাট বাতিল করা এবং কর ব্যবস্থার যৌক্তিককরণ করা হলে বিনিয়োগকারীরা নেটওয়ার্কে আরও অর্থ ঢালতে উৎসাহিত হবেন।

ইকোসিস্টেম সরলীকরণ: বাজারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের জটিল ইকোসিস্টেমকে সরলীকরণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, অপারেটররা যত বেশি অন্য কোন অপারেটরের উপর নির্ভর করবে তার নেতিবাচক প্রভাব তত বেশি পড়বে। এতে খরচও বৃদ্ধি পায়।

ডিভাইসের ক্রয়ক্ষমতা: স্মার্টফোনের উপর আমদানি শুল্ক বা তার সংযোজন ব্যয় কমানোর বিকল্প নেই। আমারা যখন ফাইভজি সেবার কথা বলছি তখনও দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ নেটওয়ার্কের সেবা নিতে পারছেন না। এই অবস্থায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা না গেলে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না।

সংযোগের শক্তি, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির নতুন অধ্যায়

ইয়োহান বুসে, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বাংলালিংক



সংযোগ এখন আর নিছক আধুনিক সুবিধা নয়। এটি পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির স্নায়ুতন্ত্রে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১২ কোটিরও বেশি মানুষ ই-কমার্স ও ডিজিটাল পেমেন্ট থেকে শুরু করে জীবনরক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো নানা প্রয়োজনে মোবাইল ইন্টারনেট সেবার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ যখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার ডিজিটাল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তা হলো, জ্বালানি নির্ভরযোগ্যতা ও ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করা হলে দেশের অগ্রগতির পরবর্তী অধ্যায়ের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে।

আমরা এমন এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে ডিজিটাল ও জ্বালানি খাত এখন আর উন্নয়নের দুটি পৃথক পথ নয়, বরং একই মুদ্রার দুই পিঠ। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় লোডশেডিং প্রায় ১৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি স্বল্পমেয়াদে অবকাঠামোর উপর চাপ তৈরি করলেও একইসঙ্গে এটি স্পষ্ট করে দেয় যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উন্নয়ন করলে তা দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশও এই দিকেই ইঙ্গিত করে। জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ এখনও সবচেয়ে দক্ষ ও সাশ্রয়ী উৎস। যার পাইকারি সরবরাহ ব্যয় প্রতি ইউনিট প্রায় ১১ থেকে ১২ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ০.১০ থেকে ০.১১ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় দক্ষতাভেদে প্রতি ইউনিট ৪৫ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা প্রায় ০.৪০ থেকে ০.৫৫ মার্কিন ডলারের সমান। এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি সাধারণ জেনারেটরে প্রায় ০.২৫ থেকে ০.৩০ লিটার জ্বালানি খরচ হয়। বর্তমান আমদানিনির্ভর বাজারদরে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয় বাদ দিয়েই শুধু জ্বালানির খরচই গ্রিড বিদ্যুতের প্রায় তিনগুণ।

তীব্র লোডশেডিংয়ের সময় শিল্প খাতের হিসাব অনুযায়ী, দৈনিক জ্বালানির চাহিদা প্রায় এক লাখ লিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বর্তমান জ্বালানি মূল্য অনুযায়ী এর ব্যয় দাঁড়ায় দৈনিক প্রায় ১ লাখ মার্কিন ডলার। সম্পদের এই অপচয় না হলে তা অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সেবার নাগাল সম্প্রসারণ কিংবা প্রয়োজনীয় সরকারি সেবায় পুনর্বিনিয়োগ করা যেত। এই নির্ভরতা কমাতে পারলে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় সম্পদের উপর চাপ হ্রাস করার একটি স্পষ্ট পথ তৈরি হয়।

এর বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরও চিত্তাকর্ষক। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, বাংলাদেশের জিডিপি এখন প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি এবং দেশ ধীরে ধীরে একটি প্রাণবন্ত ডিজিটালনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলছে। এই গতি ধরে রাখতে নির্ভরযোগ্য সংযুক্তির ভূমিকাই প্রধান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ– অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি ৮০ লাখ মানুষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগের সমস্যায় ভোগেন। ব্যবসা, সেবা এবং দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্রই এর প্রভাব পড়ে।

টেকসই সংযোগ নিশ্চিত হলে লেনদেন সহজতর হয়, ব্যবসায়িক কার্যক্রম নির্বিঘ্ন থাকে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। নির্ভরযোগ্য সংযোগের সামান্য উন্নতিও বৃহৎ পরিসরে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে যা বিভিন্ন খাতে প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশের সম্প্রসারণশীল ডিজিটাল ইকোসিস্টেম বিস্তারে সহায়তা করবে।

এর একটি শক্তিশালী রাজস্বের দিকও রয়েছে। জাতীয় কোষাগারে টেলিকম খাতের অবদান এখনও উল্লেখযোগ্য। নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের বিস্তার বৃদ্ধি করা গেলে রাজস্ব সুরক্ষিত করা সম্ভব, যা পক্ষান্তরে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারে ধারাবাহিক অবদান নিশ্চিত করে।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব আরও গভীর। বহু মানুষের কাছে সংযোগ মানেই সুযোগের দুয়ার। অনলাইনে পড়াশোনা করা একজন শিক্ষার্থী, নতুন বাজারে পৌঁছানোর চেষ্টায় থাকা একজন উদ্যোক্তা, কিংবা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী একজন রোগী সবাই নির্ভর করেন নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্কের উপর। এই ভিত্তি শক্তিশালী করলে লাখো মানুষের জন্য অন্তর্ভুক্তি ও সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে।

সামনের দিকে তাকালে, অগ্রগতির দুটি ক্ষেত্র ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রথমত, বিদ্যুৎ বরাদ্দে টেলিযোগাযোগকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবা হিসেবে বিবেচনা করলে নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, পাশাপাশি ব্যয়বহুল বিকল্পের উপর নির্ভরতাও কমবে। টেকসই জ্বালানি খাত ব্যবসা, শিক্ষার্থী ও জনগোষ্ঠীকে আস্থার সঙ্গে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, স্যাটেলাইটভিত্তিক সংযোগের অগ্রগতি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সুরক্ষার এক নতুন মাত্রা যোগ করছে। স্টারলিংক ও বাংলালিংকের যৌথ উদ্যোগে চালু হতে যাওয়া ডিরেক্ট-টু-ডিভাইস স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মতো সেবা বাড়তি সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি করবে। এর ফলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংযোগ সচল থাকবে, যা জাতীয় প্রস্তুতি (প্রিপায়ারডনেস) জোরদার করবে এবং সেবাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে সংযোগের আওতা বৃদ্ধি করবে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। জ্বালানি সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা যদি ডিজিটাল লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের সামনে তিনটি বড় সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। প্রথমত, কাজের দক্ষতা বাড়বে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও গতি পাবে। তৃতীয়ত, গড়ে উঠবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ, যেখানে সবাই এর সুফল পাবে। শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, এই সংযোগ শক্তিশালী করার পেছনে আরও গভীর লক্ষ্য রয়েছে। এটি মানুষকে ক্ষমতায়িত করে উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেয় আর ডিজিটাল অর্থনীতির সুফল যেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করে।

এই ভিত্তি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। এখন দরকার শুধু সঠিক মনোযোগ ও সঠিক দিকনির্দেশনা। তা হলেই বাংলাদেশের এই পরবর্তী অধ্যায় হয়ে উঠবে আরও রূপান্তরমূলক।

টেকসই টেলিকম ইকোসিস্টেমই বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি

ইয়াসির আজমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন



বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় টেলিযোগাযোগ ক্রমেই আরও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে যা মানুষ, ব্যবসা ও শিল্পখাতকে নতুন নতুন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে। এই সাক্ষাৎকারে গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান টেকসই ও বিনিয়োগবান্ধব টেলিকম ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রাহককেন্দ্রিক ও টেকসই করার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশের টেলিকম খাত ক্রমেই দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপ টিকিয়ে রাখতে এবং দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক লক্ষ্যে আরও অর্থবহভাবে অবদান রাখতে এই শিল্পের জন্য কী কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান: টেলিযোগাযোগ এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। আজ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আর্থিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, বিনোদনসহ মানুষের দৈনন্দিন নির্ভরশীল অসংখ্য কার্যক্রমকে শক্তি জোগাচ্ছে। এই ভিত যত মজবুত হবে আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতিও তত শক্তিশালী হবে।

বাংলাদেশ ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা কার্যক্রম পরিচালনা করতে ডিজিটাল অবকাঠামো আরও বড় ভূমিকা রাখবে। এর জন্য প্রয়োজন এমন একটি পরিবেশ যেখানে আস্থার সঙ্গে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা যায়।

আমরা মনে করি, বিনিয়োগবান্ধব এবং অনুমান করা যায় এমন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। টেলিকম একটি দীর্ঘমেয়াদি, মূলধন-নিবিড় ব্যবসা। বিনিয়োগ নিয়ে আজ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার ফল বহু বছর ধরে চলমান থাকে। তাই নীতির স্থিতিশীলতা, নিয়ন্ত্রণ

কাঠামোর স্বচ্ছতা এবং গঠনমূলক সংলাপ এত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এটাও মনে করি যে দীর্ঘদিনের শিল্প-সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ একটি কাঠামোবদ্ধ ও সময়োপযোগী উপায়ে সমাধান করা জরুরি। অনিশ্চয়তা দেখা দিলে মূল্যবান সময় ও সম্পদের অপচয় হয় যা উদ্ভাবন, নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত হতে পারত। একটি শক্তিশালী বিনিয়োগ পরিবেশ সবার জন্যই কল্যাণকর। এই পরিবেশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা, ডিজিটাল অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আস্থা জোরদার করা এবং মানুষ ও ব্যবসার জন্য আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে।

সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও শিল্পখাত একই লক্ষ্যে কাজ করছে। আশাব্যঞ্জক দিক হলো, অংশীজনদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংলাপ এবং সমাধান খুঁজে বের করতে গঠনমূলকভাবে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। সব পক্ষের সদিচ্ছা থাকলে জটিল সমস্যাও সমাধান করা সম্ভব। আমাদের উচিত এই অগ্রগতি লালন করা এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরও বেশি আস্থা গড়ে তোলা। এতে আমরা দ্রুততর সময়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারব এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারব যেখানে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি বিকশিত হতে পারে।

ডিজিটাল সেবার চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ টেলিকম নীতি প্রণয়ন এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামোতে অব্যাহত বিনিয়োগ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন?

ইয়াসির আজমান: প্রথম ব্যাপার হলো, আমাদের এই খাতকে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। টেলিকম শিল্প মৌলিকভাবে বদলে গেছে। কয়েক বছর আগে অপারেটররা মূলত একটি উলম্ব ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যে কাজ করত। আজ আমরা পুরো অর্থনীতি জুড়ে অনুভূমিকভাবে কাজ করছি। সংযোগ এখন মোবাইল আর্থিক সেবা, ডিজিটাল বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ আরও অনেক খাতের প্রাণসঞ্চারী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ টেলিকম যে অবদান রাখছে, তা আমাদের নিজস্ব শিল্পের সীমানা থেকেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও শিল্পখাত একই লক্ষ্যে কাজ করছে। আশাব্যঞ্জক দিক হলো, অংশীজনদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংলাপ এবং সমাধান খুঁজে বের করতে গঠনমূলকভাবে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। সব পক্ষের সদিচ্ছা থাকলে জটিল সমস্যাও সমাধান করা সম্ভব। আমাদের উচিত এই অগ্রগতি লালন করা এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরও বেশি আস্থা গড়ে তোলা। এতে আমরা দ্রুততর সময়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারব এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারব যেখানে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি বিকশিত হতে পারে।

একই সঙ্গে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের নিয়ন্ত্রক কাঠামোকেও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ধীরে ধীরে মাইক্রো-রেগুলেশন থেকে সরে আসা, যেখানে অধিকতর নমনীয় রেগুলেশন প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং শিল্পখাতকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হবে-কোন কোন ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ডিরেগুলেশন বাজারের দক্ষতা বাড়াতে, নতুন ও উদ্ভাবনী সেবা চালু করতে এবং গ্রাহকের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। এর মাধ্যমে অপারেটররা আরও কার্যকরভাবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য আরও উন্নত ও বৈচিত্র্যময় সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এ কারণেই বিনিয়োগকে এর মাধ্যমে সৃষ্ট বৃহত্তর অর্থনৈতিক মূল্য ও সম্ভাবনার আলোকে বিবেচনা করা উচিত। অপারেটররা যখন উন্নত ও শক্তিশালী অবকাঠামোতে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয় তখন এর সুফল কেবল টেলিযোগাযোগ খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এর ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরও উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারে, উদ্যোক্তারা নতুন গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পান এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আরও বেশি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

আগামীর পথচলায় আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়ই গ্রাহককে রাখতে হবে। আমরা যে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোই তৈরি করি না কেন, তার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অপারেটরদের জন্য ধারাবাহিক বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে মানুষদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও উচ্চমানের সংযোগসেবা নিশ্চিত করা। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি বিকল্প ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের সুযোগ তৈরি করা,

আগামীর পথচলায় আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়ই গ্রাহককে রাখতে হবে। আমরা যে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোই তৈরি করি না কেন, তার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অপারেটরদের জন্য ধারাবাহিক বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে মানুষদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও উচ্চমানের সংযোগসেবা নিশ্চিত করা।

এই স্পেকট্রাম বরাদ্দের অংশ হিসেবে গ্রামীণফোন আগামী ১৩ বছরে জাতীয় কোষাগারে প্রায় ২,২০০ কোটি টাকা প্রদান করবে। পাশাপাশি, দেশব্যাপী আমাদের নেটওয়ার্কে এই স্পেকট্রাম কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে যেন এর সুফল গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো যায়। মূল বিষয় হলো একটি ভারসাম্য নিশ্চিত করা যাতে সরকারের জন্য যথাযথ রাজস্ব ও ভ্যালু সৃষ্টি হয় এবং অপারেটরদেরও অবকাঠামো ও সেবায় পুনঃবিনিয়োগের সক্ষমতা থাকে। এর ফলে গ্রাহকরা আরও উন্নত ও সাশ্রয়ী সেবা পাবেন, ডিজিটাল ব্যবহার বাড়বে এবং সামগ্রিক অর্থনীতি উপকৃত হবে। দীর্ঘমেয়াদে এটাই আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ডিজিটাল সেবার গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার ত্বরান্বিত করা এবং সংযোগের সুফল আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই শিল্পখাত- বাংলাদেশে প্রায়শই এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলা হয়ে থাকে। এই ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান: এ ক্ষেত্রেও আমাদের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি সরকারেরই রাজস্ব আহরণের যৌক্তিক লক্ষ্য থাকে। তবে এর পাশাপাশি দেখতে হবে, এই রাজস্ব কীভাবে গ্রাহক ও সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে অবদান রাখতে পারছে। সম্প্রতি ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে ১০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম অধিগ্রহণ এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি আমাদের গ্রাহকদের জন্য ইনডোর কাভারেজ শক্তিশালী করবে; বিশেষ করে, গ্রামীণ ও অনগ্রসর এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, নির্ভরযোগ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং আরও উন্নতর ভয়েস ও ডাটা সেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
এই স্পেকট্রাম বরাদ্দের অংশ হিসেবে গ্রামীণফোন আগামী ১৩ বছরে জাতীয় কোষাগারে প্রায় ২,২০০ কোটি টাকা প্রদান করবে। পাশাপাশি, দেশব্যাপী আমাদের নেটওয়ার্কে এই স্পেকট্রাম কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে যেন এর সুফল গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো যায়।
মূল বিষয় হলো একটি ভারসাম্য নিশ্চিত করা যাতে সরকারের জন্য যথাযথ রাজস্ব ও ভ্যালু সৃষ্টি হয় এবং অপারেটরদেরও অবকাঠামো ও সেবায় পুনর্বিনিয়োগের সক্ষমতা থাকে। এর ফলে গ্রাহকরা আরও উন্নত ও সাশ্রয়ী সেবা পাবেন, ডিজিটাল ব্যবহার বাড়বে এবং সামগ্রিক অর্থনীতি উপকৃত হবে। দীর্ঘমেয়াদে এটাই আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একে কীভাবে দেখছেন এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে শিল্পখাতের অবদান জোরদার করতে আর কী করা যেতে পারে?

ইয়াসির আজমান: আমি মনে করি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ইতিবাচক দিকনির্দেশনার জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। টেলিকম খাতে আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে আমি একে টেলিকম, আইসিটি ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের জন্য সামগ্রিক বাজেটগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করি।
বিশেষভাবে আশাব্যঞ্জক হলো এর সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। সিম কর প্রত্যাহার, স্মার্টফোন ও ডিজিটাল ডিভাইসে প্রণোদনা, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য সহায়তা এবং ভ্যাট ও কর ব্যবস্থার সংস্কারসহ গ্রাহকের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার ও বিটিআরসির গঠনমূলক সহযোগিতার পাশাপাশি এই পদক্ষেপগুলো শক্তিশালী ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।
আমাদের প্রতিশ্রুতিও পরিষ্কার। গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত সুবিধা তাদের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হবে। অপরদিকে গ্রামীণফোন যে সুবিধা পাবে তা আরও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক, উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণে পুনর্বিনিয়োগ করা হবে। তবে এখনো করণীয় রয়েছে, বিশেষ করে সম্পূরক শুল্কসহ সামগ্রিক করের বোঝা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা প্রয়োজন। তাহলে সাশ্রয়ী মূল্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। তবুও দিকনির্দেশনাটি আশাব্যঞ্জক। এই সহযোগিতামূলক পথে চলতে থাকলে টেলিকম ও আইসিটি খাত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে আরও লাখ লাখ মানুষকে ডিজিটাল অর্থনীতির আওতায় আনতে পারবে। এটা ২০৩৪ সালের মধ্যে আমাদের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি গড়ার যে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য তা অর্জনে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশ উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যেখানে বড় আকারের বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। টেলিকম খাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ শক্তিশালী করতে এবং আরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করতে কী করা যেতে পারে?

এ ধরনের বিনিয়োগ যেন বাংলাদেশে আরও আসে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক নীতিমালা, সহজ প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতির স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা নিয়ে মূলধন বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান বিনিয়োগগুলো সুরক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যারা আগে থেকেই এখানে বিনিয়োগ করছেন তারাই বৈশ্বিক বিনিয়োগ সমাজের কাছে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দূত হিসেবে কাজ করেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিরোধসমূহ যথাযথভাবে ও সময় মতো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সালিসি (আরবিট্রেশন) ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা গেলে তা বিনিয়োগকারীদের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

ইয়াসির আজমান: বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির গল্প রয়েছে এবং ডিজিটাল অর্থনীতি হিসেবে গড়ে উঠতে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার যখন ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে তখন মূলধন, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও উদ্ভাবন খাতে বৃহত্তর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই এফডিআই কী করতে পারে গ্রামীণফোন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৫৬৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছি এবং জাতীয় কোষাগারে ১,৪২৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন টাকার বেশি অবদান রেখেছি। আমাদের নেটওয়ার্কে আমরা আট কোটি ৬৮ লাখেরও বেশি গ্রাহককে সংযুক্ত করছি এবং প্রতি বছর অবকাঠামোতে প্রায় ৩০ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করছি। এটা উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য ডিজিটাল ভিত্তিকে ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী করছে।

এ ধরনের বিনিয়োগ যেন বাংলাদেশে আরও আসে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক নীতিমালা, সহজ প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতির স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেলে বিনিয়োগকারীরা আস্থা নিয়ে মূলধন বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান বিনিয়োগগুলো সুরক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যারা আগে থেকেই এখানে বিনিয়োগ করছেন তারাই বৈশ্বিক বিনিয়োগ সমাজের কাছে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দূত হিসেবে কাজ করেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিরোধসমূহ যথাযথভাবে ও সময় মতো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সালিসি (আরবিট্রেশন) ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা গেলে তা বিনিয়োগকারীদের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

প্রকৃতপক্ষে পুঁজি সেখানেই যায় যেখানে স্পষ্টতা থাকে। স্থিতিশীল নীতি, নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করা গেলে বিদ্যমান বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন এফডিআই আকৃষ্ট করাও সম্ভব হবে।

দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণফোনের দায়িত্ব মূল ব্যবসার বাইরে কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান: আমাদের দায়িত্ব শুধু সংযোগ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতি যেন সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে, ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা গড়ে তোলে এবং আগামী প্রজন্মের জন্যও তা বজায় থাকে। লাখ লাখ মানুষের জন্য অর্থবহ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অর্থ হলো শিক্ষা, আর্থিক সেবা, জীবিকা এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের ডিজিটাল ইনক্লুশন উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা ৩২ জেলার ৩৩ লাখেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছি এবং আমাদের লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে আরও ৪০ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছানো। আমরা চাই আমাদের তরুণরা দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিতে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাক। চার লাখেরও বেশি নিবন্ধনসহ গ্রামীণফোন একাডেমি ডিজিটাল ও এআই সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। অন্যদিকে ইউনিসেফের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ৯৭ লাখেরও বেশি শিশু এবং ২ লক্ষ ৩৮ হাজার শিক্ষক ডিজিটাল সাক্ষরতা ও অনলাইন নিরাপত্তার দক্ষতা অর্জন করেছেন।

এই অগ্রগতি অবশ্যই টেকসই হতে হবে। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি আমরা সমানভাবে পরিবেশের ওপর আমাদের প্রভাব কমানোর দিকেও মনোযোগ দিচ্ছি। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০৩৪ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর অঙ্গীকার করেছি আমরা। পাশাপাশি আমাদের কার্যক্রমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারও বাড়াচ্ছি যার মধ্যে রয়েছে এক হাজারের বেশি সৌরশক্তিচালিত নেটওয়ার্ক সাইট। আমার কাছে আমাদের প্রকৃত অবদানের মাপকাঠি শুধু এটা নয় যে আমরা কতজন মানুষকে সংযুক্ত করেছি। বরং মাপকাঠি হলো সংযোগ মানুষকে ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করছে কি না, তরুণরা সামনের সুযোগগুলোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কি না এবং আমরা এমনভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারছি কি না যা একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই।

নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে টেকসই টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা



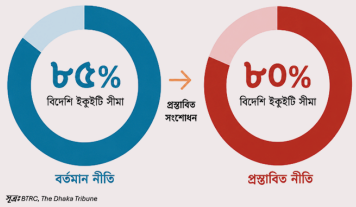
লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত এখন আর শুধু একটি সেবা খাত নয়; এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল রূপান্তরের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এই খাত সারাদেশে সংযোগ বিস্তারের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডেটার ক্রমবর্ধমান চাহিদা, ডিজিটাল সেবা এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মোবাইল অপারেটর এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। তবে একই সঙ্গে উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয়, জটিল রেগুলেটরি কাঠামো, অতিরিক্ত করভার এবং তীব্র বাজার প্রতিযোগিতা এই খাতের টেকসই বিকাশের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> এই খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি সহনশীল ও টেকসই টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত সেবা নিশ্চিত করা এবং অপারেটরদের আর্থিক সক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে পাশাপাশি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নতুন গ্রাহক ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে ডেটা ব্যবহার, ডিজিটাল আর্থিক সেবা, ই-কমার্স এবং বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক সেবার চাহিদাও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংযোগ যত বিস্তৃত হচ্ছে, টেলিযোগাযোগ খাত ততই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির শক্তিশালী চালিকাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। তবে এই খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি সহনশীল ও টেকসই টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত সেবা নিশ্চিত করা এবং অপারেটরদের আর্থিক সক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিদেশি মালিকানা



সূত্র: BTRC, The Dhaka Tribune

এই বাস্তবতায় বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে ডিজিটাল উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একটি সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামো অপরিহার্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বাস্তবতায় টিকে থাকতে এবং গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণ করতে অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেলকো-টেক সমাধান, উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেল এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার কৌশল গ্রহণে আরও মনোযোগী হতে হবে। এই নিবন্ধে আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোর এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যা টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর পড়ে।

নীতি সংস্কার ও লাইসেন্সিং নির্দেশিকা

আন্তর্জাতিক দীর্ঘ দূরত্বের টেলিযোগাযোগ সেবা (আইএলডিটিএস) নীতিমালা ২০১০-এর পরিবর্তে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালা (টিএনএলপি) ২০২৫ প্রণয়ন বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রক পুনর্বিন্যাস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই নীতিমালায় পূর্ববর্তী খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন লাইসেন্সিং কাঠামোর পরিবর্তে আরও সমন্বিত ও সরল একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নতুন কাঠামোতে তিনটি প্রধান লাইসেন্স শ্রেণি রাখা হয়েছে–ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টিভিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (আইসিএসপি), ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড কানেক্টিভিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (এনআইসিএসপি) এবং অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার (এএনএসপি)। এর মূল লক্ষ্য হলো লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার জটিলতা হ্রাস করা, সেবার ব্যয়সাধ্যতা, সব স্তরে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেবার মান ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি আরও জোরদার করা।

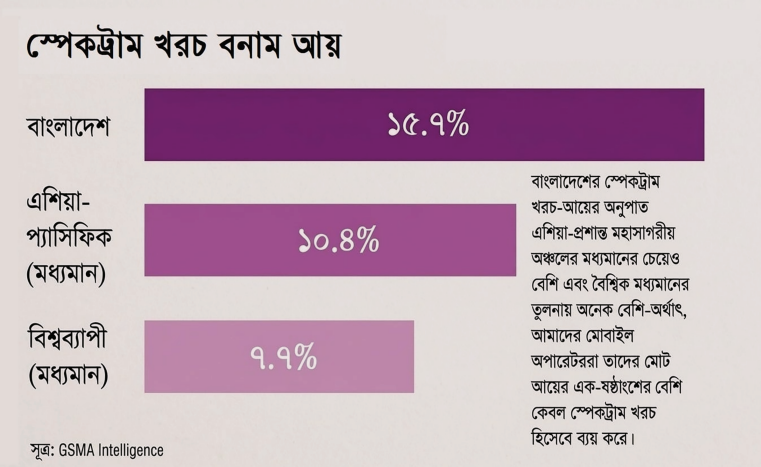
এই নীতিমালায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় ধরনের নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ভাগাভাগি করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে নেটওয়ার্ক স্থাপনের খরচ কমবে, কভারেজ বা সেবার আওতা সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হবে এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক, ৫জি ও ফাইবার নেটওয়ার্ক দ্রুত চালু ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও গতিশীল হবে। এছাড়া, এই নীতিমালার আওতায় মোবাইল ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অপারেটর (এমভিএনও) ব্যবস্থা চালুর সুযোগ তৈরি হবে এবং আইওটি, এআই-চালিত অ্যাপ্লিকেশন ও উন্নত ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির মতো নতুন প্রজন্মের সেবার প্রসার ত্বরান্বিত হবে। নীতিমালাটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সম্প্রতি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এই নীতিমালায় কিছু ছোটখাটো সংশোধনী এনেছে, যার আওতায় লাইসেন্সিং ক্যাটাগরির নাম পরিবর্তনসহ আরও কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে নীতিমালার কয়েকটি প্রস্তাবিত শর্ত নিয়ে শিল্পখাতটিতে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ রয়েছে, কারণ সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পুরো খাতের ওপর পড়তে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মোবাইল অপারেটরদের বিদেশি মালিকানার ওপর নতুন সীমা আরোপের প্রস্তাব। নীতিমালায় বিদেশি ইক্যুইটির সর্বোচ্চ সীমা ৮৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৬ সালের মে মাসে পিটিডিতে জমা দেওয়া সংশোধিত খসড়ায় আরও কমিয়ে ৮০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ শর্ত বাস্তবায়নের জন্য অপারেটরদের তিন বছরের রূপান্তরকাল দেওয়া হলেও, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশীয় পুঁজিবাজার এত বড় পরিমাণ শেয়ার ধারণ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক অবকাঠামো নির্মাণে বিপুল বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বাস্তবতাও বিবেচনায় রাখা জরুরি। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

একই সঙ্গে যৌথ মালিকানা ও যোগ্যতা-সংক্রান্ত বিধান বাজারে প্রতিযোগিতা সীমিত করা, অনিচ্ছাকৃত বাজারের কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তাদের প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত করার আশঙ্কাও তৈরি করতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান অবকাঠামো সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রির শর্ত আরোপ করা হলে তা অপারেটরদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ও পরিচালনাগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এসব বিনিয়োগ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড কানেক্টিভিটি সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এনআইসিএসপি) এবং প্রস্তাবিত সংস্কারে টাওয়ার অ্যান্ড কানেক্টিভিটি সার্ভিস প্রোভাইডারদের (টিসিএসপি) যোগ্যতা-সংক্রান্ত বিধান নিয়েও এই শিল্পখাতে উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে টাওয়ার ও ফাইবার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় এসব বিধানের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেলুলার মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের (সিএমএসপি) আন্তর্জাতিক ট্র্যাফিক থেকে অর্জিত আয়ের প্রস্তাবিত রাজস্ব ভাগাভাগির হার। কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী মোট আয়ের ৭০ শতাংশ সরকার পাবে এবং অপারেটরদের জন্য থাকবে মাত্র ৩০ শতাংশ। এই হার আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার তুলনায় অনেক বেশি এবং এটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত রাজস্ব কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

> বৈশ্বিক মোবাইল শিল্পের সংগঠন (জিএসএমএ) সতর্ক করে বলেছে, নীতিমালার বেশ কিছু প্রস্তাবিত বিধান বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে, বাজারে নতুন অংশগ্রহণ সীমিত করতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশকে দুর্বল করতে পারে, উন্মুক্ততাকে কমিয়ে দিতে পারে যা নীতিমালার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে নতুন যোগ্যতার শর্ত, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং জটিল অবকাঠামো স্থাপনের বিধান নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

> এই নীতিমালায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় ধরনের নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ভাগাভাগি করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে নেটওয়ার্ক স্থাপনের খরচ কমবে, কভারেজ বা সেবার আওতা সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হবে এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক, ৫জি ও ফাইবার নেটওয়ার্ক দ্রুত চালু ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও গতিশীল হবে।



হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত রাজস্ব ভাগাভাগির চাপ আন্তর্জাতিক সংযোগে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সেবার ব্যয়ও বাড়িয়ে দিতে পারে।

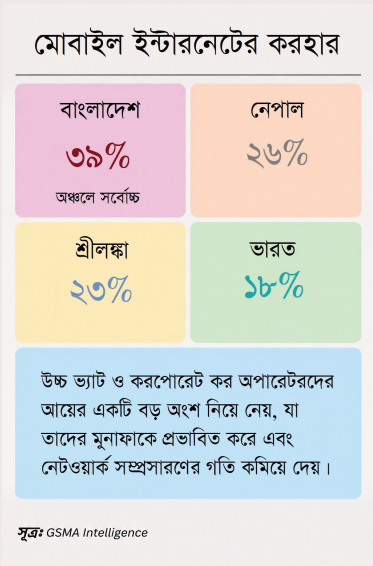
বৈশ্বিক মোবাইল শিল্পের সংগঠন (জিএসএমএ) সতর্ক করে বলেছে, নীতিমালার বেশ কিছু প্রস্তাবিত বিধান বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে, বাজারে নতুন অংশগ্রহণ সীমিত করতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশকে দুর্বল করতে পারে, উন্মুক্ততাকে কমিয়ে দিতে পারে যা নীতিমালার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে নতুন যোগ্যতার শর্ত, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং জটিল অবকাঠামো স্থাপনের বিধান নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সামনের দিনগুলোতে এই নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন অনেকটাই নির্ভর করবে বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছ ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশিকা প্রণয়নের ওপর। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই খাতটির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

স্পেকট্রাম বরাদ্দ ও মূল্য নির্ধারণ

স্পেকট্রাম হলো মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তির মৌলিক সম্পদ এবং টেলিযোগাযোগ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। পর্যাপ্ত ও সাশ্রয়ী মূল্যের স্পেকট্রাম ছাড়া অপারেটরদের পক্ষে মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করা, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা কিংবা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। স্পেকট্রামের মূল্য ও প্রাপ্যতা সরাসরি নির্ধারণ করে অপারেটররা নেটওয়ার্কে কতটা বিনিয়োগ করতে পারবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সেবার মান কতটা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে ডেটা সেবা সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অঞ্চলে সংযোগ বিস্তারে স্পেকট্রামের সাশ্রয়ীতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপরীতে, অতিরিক্ত মূল্য বা সীমিত প্রাপ্যতা নেটওয়ার্ক উন্নয়নকে ধীর করে, বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং গ্রাহকদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও উচ্চমানের সেবা নিশ্চিত করা কঠিন করে তোলে।

বাংলাদেশে স্পেকট্রাম ব্যয়-থেকে-রাজস্ব অনুপাত বর্তমানে ১৫.৭ শতাংশ, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় ১০.৪ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং বৈশ্বিক গড় ৭.৭ শতাংশের দ্বিগুণেরও বেশি। অর্থাৎ, দেশের মোবাইল অপারেটররা তাদের মোট রাজস্বের ছয় ভাগের এক ভাগেরও বেশি ব্যয় করছে শুধু স্পেকট্রামের জন্য। এর সঙ্গে কর, লাইসেন্স ফি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক চার্জ যোগ করলে সরকারের প্রতি অপারেটরদের মোট অবদান দাঁড়ায় রাজস্বের প্রায় ৫৬ শতাংশ, যেখানে বৈশ্বিক গড় মাত্র ২২ শতাংশ। এই অতিরিক্ত আর্থিক চাপ অপারেটরদের বিনিয়োগ সক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে, যখন দেশে ডেটা ব্যবহার ও ডিজিটাল সেবার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ফলে অপারেটরদের একই সঙ্গে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে–একদিকে দ্রুত বর্ধনশীল ডেটা চাহিদা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান স্পেকট্রাম ও নিয়ন্ত্রক ব্যয়।

আগামী সময়ে এই চাপ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০২৬ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ স্পেকট্রামের লাইসেন্স নবায়নের সময় আসছে, যার মধ্যে শুধু ২০২৬ সালেই বিভিন্ন ব্যান্ডে প্রায় ৮০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রামের নবায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাম্প্রতিক স্পেকট্রাম অধিগ্রহণ এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কারণে মোবাইল অপারেটররা ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্থিক চাপে রয়েছে। একই সময়ে বিটিআরসির স্পেকট্রাম রোডম্যাপ অনুযায়ী আরও কয়েকটি বৃহৎ পরিসরের স্পেকট্রাম অবমুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। ফলে নবায়ন ও নতুন বরাদ্দ–দুই ক্ষেত্রেই অপারেটরদের অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে, অথচ খাতটির আয় দীর্ঘদিন ধরে প্রায় স্থবির। জিএসএমএ-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে ৯০০, ১৮০০, ২১০০, ৭০০ এবং ইজিএসএম ব্যান্ডে বর্তমান মূল্য কাঠামো বহাল থাকলে ২০২৭ সালের মধ্যে স্পেকট্রাম ব্যয় অপারেটরদের মোট রাজস্বের ২৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। তাই খাতটির আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিনিয়োগ সক্ষমতা ধরে রাখা এবং গ্রাহকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে ২০২৬ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হতে যাওয়া এসব ব্যান্ডের নবায়ন ফি বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি।



মানসম্মত সেবা

বর্তমান ডিজিটাল বাস্তবতায় সেবার মান বা কোয়ালিটি অব সার্ভিস (কিউওএস) শুধু একটি নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা নয়; এটি অপারেটরদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার অন্যতম প্রধান নির্ধারক। নেটওয়ার্কে জট, সেবা বিভ্রাট কিংবা অসম কাভারেজ শুধু গ্রাহকের অভিজ্ঞতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না; বরং ডিজিটাল আর্থিক সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্সসহ সমগ্র ডিজিটাল অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই কিউওএস উন্নয়নে অপারেটরদের ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) নেটওয়ার্ক অপ্টিমাইজেশন এবং স্মার্ট অবকাঠামোতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। গ্রাহকদের প্রত্যাশা এবং সর্বক্ষণ সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা যত বাড়ছে, সেবায় সামান্য বিঘ্নও তত দ্রুত ব্র্যান্ডের সুনাম ও আর্থিক ফলাফলে প্রভাব ফেলছে। ফলে কিউওএসে বিনিয়োগ এখন আর শুধু নিয়ন্ত্রক সম্মতির বিষয় নয়; এটি একটি কৌশলগত ব্যবসায়িক অপরিহার্যতা।

বিনিয়োগকারীদের জন্যও কিউওএস একটি মূল মূল্যায়ন সূচক হওয়া উচিত। কারণ উন্নত সেবার মান গ্রাহক ধরে রাখতে সহায়তা করে, গ্রাহক হারানোর হার কমায় এবং ব্যবহারকারীপ্রতি গড় আয় (এআরপিইউ) বৃদ্ধি করে। বর্তমানে সেবার মান সরাসরি একটি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা, ব্র্যান্ড মূল্য এবং বাজারে অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেসব অপারেটর ধারাবাহিকভাবে উচ্চমানের সেবা নিশ্চিত করতে পারে, তারা প্রিমিয়াম গ্রাহক আকৃষ্ট করা, উচ্চমূল্যের পোস্টপেইড সেবা সম্প্রসারণ এবং নতুন ডিজিটাল সেবার বাজারজাতকরণে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা অর্জন করে।

এ ক্ষেত্রে অপারেটরদের স্ব-সম্মতি (Self-compliance) ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি কল ও ডেটা রাউটিংয়ে অপ্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী ধাপ কমিয়ে আরও দক্ষ ও সুবিন্যস্ত নেটওয়ার্ক স্থাপত্য গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এর ফলে কল সম্পন্ন হওয়ার হার বৃদ্ধি, লেটেন্সি হ্রাস এবং আরও স্থিতিশীল সংযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সহজতর নেটওয়ার্ক কাঠামো ত্রুটি শনাক্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে আরও কার্যকর করবে, ফলে অপারেটররা দ্রুত সমস্যার উৎস চিহ্নিত করে সমাধান দিতে পারবে। ভবিষ্যতে ডেটা ট্র্যাফিক এবং রিয়েল-টাইম ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার যত বাড়বে, এই সক্ষমতার গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাবে।

টেলিযোগাযোগ খাতে ভ্যাট ও কর কাঠামো

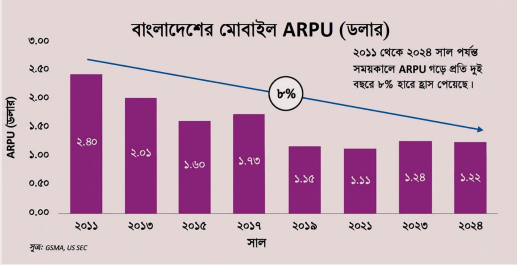
বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে উচ্চ ভ্যাট ও কর্পোরেট কর অপারেটরদের আয়ের একটি বড় অংশ নিচ্ছে, যা তাদের মুনাফা, বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ–সবকিছুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেটের ওপর মোট করহার ৩৯ শতাংশ, যা বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ কর আরোপকারী দেশগুলোর কাতারে নিয়ে এসেছে।
তুলনামূলকভাবে নেপালে এই হার ২৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ২৩ শতাংশ এবং ভারতে ১৮ শতাংশ। উচ্চ করহার অপারেটর ও গ্রাহক–উভয়ের ব্যয়ই বাড়ায়, বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং উদ্ভাবনের গতি কমিয়ে দেয়। একই সঙ্গে অনিশ্চিত করনীতি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই খাতের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে স্বল্পমেয়াদি রাজস্ব আহরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফলের মধ্যে একটি কার্যকর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। ভ্যাট ও করের বোঝা যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং একটি স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত কর কাঠামো গড়ে তোলা গেলে গ্রাহকদের ব্যয় কমবে, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়বে, বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং অপারেটররা আরও দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে পারবে। সময়ের দাবি হলো এমন একটি ভবিষ্যতমুখী টেলিযোগাযোগ করনীতি, যা বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে এবং খাতটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করে তুলবে।

টেলিযোগাযোগ সেবার মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটররা ইতোমধ্যে বিশ্বের অন্যতম কম মূল্যে ভয়েস ও ডেটা সেবা প্রদান করছে। তাই এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আরও কম মূল্য নয়; বরং উন্নত সেবার মান, নতুন ডিজিটাল পণ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার নিশ্চিত করা। টেলিযোগাযোগ সেবার মূল্য নির্ধারণ কেবল বাজার প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সরকারি কর ও ফি, নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিনিয়োগ, পরিচালন ব্যয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে (এসওএফ) অবদান এবং মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক যন্ত্রপাতির দামের মতো বহুমাত্রিক বিষয়।

গত এক দশকে দেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৫ সালে যেখানে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ৮০ লাখ, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১১ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বাজার দ্রুত ভয়েসনির্ভর সেবা থেকে ডেটানির্ভর সেবার দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে ভয়েস আয়ের ধারাবাহিক পতন, উচ্চ স্পেকট্রাম ব্যয় এবং নেটওয়ার্কে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত কম মূল্যের ডেটা সেবা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখা কঠিন করে তুলছে। ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মোবাইল অপারেটরদের গড় ব্যবহারকারীপ্রতি আয় (এআরপিইউ) প্রায় ৪৯ শতাংশ কমে গেছে, যা মূল্যচাপের তীব্রতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তাই দায়িত্বশীল মূল্য নির্ধারণ শুধু অপারেটরদের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য নয়, নির্ভরযোগ্য ও উচ্চগতির দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্যও অপরিহার্য। সাশ্রয়ী মূল্যের ডেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিচে মূল্য নির্ধারণ করলে সেবার মান, উদ্ভাবন এবং দেশের ডিজিটাল



রূপান্তরের গতি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফাইভজি: বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের পরবর্তী প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন

বিশ্বজুড়ে টেলিযোগাযোগ অপারেটররা যখন দ্রুতগতিতে ফাইভজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগাচ্ছে, তখন বাংলাদেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অপারেটররা নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়নে ২২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছে, যা প্রমাণ করে ফাইভজি আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, বরং বর্তমানের বাস্তবতা। বাংলাদেশে ফাইভজি প্রযুক্তির কার্যকর বাস্তবায়ন নতুন এন্টারপ্রাইজ সেবা চালু, শিল্পখাতের ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত এবং দেশকে আঞ্চলিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে আরও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগবান্ধব নীতি, সাশ্রয়ী স্পেকট্রাম এবং একটি সুস্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ। সহায়ক নিয়ন্ত্রক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে ফাইভজি বাংলাদেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে।

হ্যান্ডসেট নিয়ন্ত্রণ ও স্মার্টফোনের প্রসার

বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য বৈধ মোবাইল ডিভাইস শনাক্ত করা, অবৈধ আমদানি প্রতিরোধ, চুরি হওয়া হ্যান্ডসেট ব্লক করা এবং কর-সংক্রান্ত সম্মতি নিশ্চিত করা। এর সফল বাস্তবায়ন দেশের টেলিযোগাযোগ বাজারকে আরও সুশৃঙ্খল করবে এবং নকল ও অনিবন্ধিত ডিভাইসের কারণে হওয়া রাজস্ব ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। তবে এর সঙ্গে কিছু স্বল্পমেয়াদি চ্যালেঞ্জও রয়েছে, বিশেষ করে ডিভাইসের সাশ্রয়ীতা এবং নতুন গ্রাহক যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের বাজারের একটি বাস্তবতা হলো, দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকরা বিভিন্ন উৎস থেকে মোবাইল ফোন কেনার সুযোগ পেয়ে এসেছেন। তাই পর্যাপ্ত বিকল্প এবং যুক্তিসংগত মূল্যে বৈধ ডিভাইস নিশ্চিত না করে অনানুষ্ঠানিক বাজারের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে তা গ্রাহকদের জন্য ভোগান্তির কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখনো প্রায় ৬ কোটি ১০ লাখ মানুষের হাতে কোনো মোবাইল ফোন নেই। অন্যদিকে, বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের মধ্যেও উচ্চমূল্যের কারণে অনেকেই এখনো স্মার্টফোনের পরিবর্তে সাধারণ (ফিচার) ফোন ব্যবহার করছেন। এই চিত্র দেশের ডিজিটাল বৈষম্যের বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক গ্রাহক এখনো স্বল্পমূল্যের বা ব্যবহৃত (সেকেন্ড-হ্যান্ড) হ্যান্ডসেটের ওপর নির্ভরশীল। এসব ডিভাইস এনইআইআরের আওতায় অকার্যকর হয়ে গেলে গ্রাহক হারানোর ঝুঁকি এবং নতুন গ্রাহক বৃদ্ধির গতি–উভয়ই প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য বৈধ স্মার্টফোন কেনা এখনো বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ। ফলে ডিভাইসের সাশ্রয়ীতা নিশ্চিত না করা গেলে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

এই বাস্তবতায় অপারেটর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ট্রেড-ইন কর্মসূচি, সহজ কিস্তিতে স্মার্টফোন সরবরাহ, স্বল্পমূল্যের ডিভাইস স্কিম এবং লক্ষ্যভিত্তিক বিপণন কৌশল গ্রহণ করা। একই সঙ্গে এনইআইআর বৈধ ডিভাইস, ডিভাইস মেরামত এবং মূল্য সংযোজনকারী ডিজিটাল সেবা খাতে নতুন বিনিয়োগের সুযোগও তৈরি করতে পারে। যথাযথ পরিকল্পনা ও গ্রাহকবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও বাজার আধুনিকায়নের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন নীতিমালা ও সংস্কারের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে এর বাস্তবায়নের ওপর যেখানে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা, প্রযুক্তিনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নেওয়া হবে প্রধান অগ্রাধিকার। একটি স্থিতিশীল, বিনিয়োগবান্ধব ও ভবিষ্যতমুখী নীতিগত পরিবেশ গড়ে তোলা গেলে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত আরও শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আজ টেলিযোগাযোগ খাতের ভূমিকা কেবল মানুষকে সংযুক্ত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। ডিজিটাল সংযোগের বিস্তার, নতুন প্রযুক্তির গ্রহণ এবং সবার জন্য সহজলভ্য ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই খাত দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করতে, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এবং একটি টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নিবন্ধ

২০২৬-২৭ অর্থবছর বাজেট

সিম ট্যাক্স প্রত্যাহার বাংলাদেশের ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে সহায়ক হতে পারে

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এসেছে। দেশ যখন টেকসই প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে, তখন ৩০০ টাকার সিম ট্যাক্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের মতো একটি নীতিগত পদক্ষেপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বাজেট নিয়ে আলোচনায় সাধারণত বড় ধরনের আর্থিক বরাদ্দ ও অবকাঠামো প্রকল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ হয়। তবে ডিজিটাল সংযোগের পথে বাধা হ্রাস করার উদ্যোগ বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আজকের অর্থনীতিতে মোবাইল সংযোগ আর কোনো বিলাসিতা নয়। এটি ক্রমশই শিক্ষা, আর্থিক সেবা, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সরকারি সেবাপ্রাপ্তির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে।

দীর্ঘদিন ধরে সিম ট্যাক্স ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাথমিক ব্যয়ে বাধা হয়ে ছিল। রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশে এটি চালু হলেও স্বল্প আয়ের মানুষ ও নতুন ব্যবহারকারীদের, বিশেষত গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীদেরই এর ভার সবচেয়ে বেশি করে বহন করতে হচ্ছিল। এই ট্যাক্স প্রত্যাহার একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে ডিজিটাল সংযোগকে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির সহায়ক হিসেবেই বিবেচনা করা উচিৎ।

সংযোগ সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিকভাবে কী উপকার হয় তা সবার জানা। ফ্রন্টিয়ার ইকোনমিক্সের সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, মোবাইল সংযোগের হার এক শতাংশ বাড়লে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ে ০.১২ শতাংশ। এর অর্থ স্পষ্ট– ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ করলে যে সুফল মেলে, তার বিস্তার টেলিযোগাযোগ খাতের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

সম্প্রসারিত মোবাইল সংযোগ ছোট ব্যবসাকে নতুন গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এটি ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণ সহজ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ায়। যত বেশি মানুষ ও ব্যবসা ডিজিটালি যুক্ত হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত বেশি উৎপাদনশীল, স্বচ্ছ ও সম্প্রসারণযোগ্য হয়ে উঠবে।

সম্প্রসারিত মোবাইল সংযোগ ছোট ব্যবসাকে নতুন গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এটি ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণ সহজ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ায়। যত বেশি মানুষ ও ব্যবসা ডিজিটালি যুক্ত হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত বেশি উৎপাদনশীল, স্বচ্ছ ও সম্প্রসারণযোগ্য হয়ে উঠবে।



স্পেকট্রাম হলো সেই অপরিহার্য সম্পদ যা মোবাইল অপারেটরদের কভারেজ বৃদ্ধি করতে, নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল সেবা চালু করতে সাহায্য করে। কিন্তু অর্থনীতির অনেক বাজারের তুলনায় বাংলাদেশে স্পেকট্রামের দাম বেশি। এতে অপারেটরদের উপর অনেক আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সেবার মান উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সীমিত হয়ে পড়ে।

সহজ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ায়। যত বেশি মানুষ ও ব্যবসা ডিজিটালি যুক্ত হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত বেশি উৎপাদনশীল, স্বচ্ছ ও সম্প্রসারণযোগ্য হয়ে উঠবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি বৃহত্তর করভিত্তি এবং টেকসই রাজস্ব আহরণে অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশ এখন একটি চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতির চাপ ও রাজস্ব আহরণে সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে প্রণোদনা দেয় এমন নীতি জরুরি।

সার্বিকভাবে তাই সিম ট্যাক্স প্রত্যাহার একটি উৎসাহব্যাঞ্জক পদক্ষেপ। তবে একে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। ডিজিটাল কর ও বিনিয়োগ নিয়ে যে আলোচনা চলছে এটি তারই একটি অংশ। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত এখনও একাধিক স্তরে কর, ফি ও শুল্কের বোঝা বহন করছে। এতে সংযোগের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তি হালনাগাদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের দরকার হয়। দেশ যখন ডিজিটাল সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করতে ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চাইছে তখন ডিজিটাল অবকাঠামোর সামগ্রিক আর্থিক কাঠামো পর্যালোচনা করা জরুরি।

তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো স্পেকট্রাম নীতি। স্পেকট্রাম হলো সেই অপরিহার্য সম্পদ যা মোবাইল অপারেটরদের কভারেজ বৃদ্ধি করতে, নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল সেবা চালু করতে সাহায্য করে। কিন্তু অর্থনীতির অনেক বাজারের তুলনায় বাংলাদেশে স্পেকট্রামের দাম বেশি। এতে অপারেটরদের উপর অনেক আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সেবার মান উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সীমিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ যখন তার ডিজিটাল রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে তখন স্পেকট্রামকে শুধু স্বল্পমেয়াদি রাজস্বের উৎস হিসেবে না দেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি প্রস্তুতের জন্য কৌশলগত জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। স্পেকট্রামের মূল্য নির্ধারণ ও তা বরাদ্দে বিনিয়োগবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি প্রক্ষেপণ করা হলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ দ্রুত হবে, সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে ডিজিটাল সংযোগ পৌঁছানো সহজতর হবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজ করা এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি সরলীকরণে সরকারের উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক। রেগুলেটরি অনুমান, দক্ষ সরকারি সেবা এবং সহায়ক বিনিয়োগ পরিবেশ– এই তিনটিই বেসরকারি মূলধন আকৃষ্ট করতে এবং ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান তৈরিতে অত্যন্ত জরুরি।

নীতিনির্ধারকরা সরকারি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। এ সময়ে এমন নীতি প্রণয়ন করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে সহায়তা করে ও অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করে। এই বাজেটে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতাদের উপর থেকে উৎসে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়– ডিজিটাল অর্থনীতিতে যেসব নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে এখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই একই চিন্তাধারা যদি সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে প্রয়োগ করা যায় তাহলে দ্রুত এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং উদ্ভাবনও তরান্বিত হবে।

সমাজের সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সুযোগ ও উৎপাদনশীলতা কতোটা কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত করা যায় তার উপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার যাত্রাপথ।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এখন আর প্রান্তিক বিষয় নয়; লক্ষ্য পূরণে এটি এখন কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখছে।

তাই বলা যায়, সিম ট্যাক্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিছক একটি কর নীতির পরিবর্তন নয়। বরং এটি এই স্বীকৃতির প্রতিফলন যে, সংযোগ আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে বাংলাদেশ যদি তার ডিজিটাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে বৃহত্তর নীতি কাঠামোর দিকে আরও নজর দিতে হবে যা ডিজিটাল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করে। এর মধ্যে রয়েছে টেলিকম কর এবং স্পেকট্রামের মূল্য নির্ধারণ। আজ নেটওয়ার্ক বিনিয়োগের জন্য বেশি সুযোগ তৈরি করা গেলে ডিজিটাল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দ্রুততর হবে, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে আরও উৎপাদনশীল, উদ্ভাবনী ও সমৃদ্ধ একটি অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠবে।

এই বাজেটে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতাদের উপর থেকে উৎসে কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়– ডিজিটাল অর্থনীতিতে যেসব নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে এখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই একই চিন্তাধারা যদি সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে প্রয়োগ করা যায় তাহলে দ্রুত এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং উদ্ভাবনও ত্বরান্বিত হবে।

সংযোগ বনাম ডিজিটাল ভ্যালু ক্রিয়েশন

টেলিকম খাত এক সন্ধিক্ষণে

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার, রবি আজিয়াটা পিএলসি

একটি দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার মতো প্রবল সক্ষমতা টেলিকম ছাড়া আর খুব কম শিল্পেরই আছে। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে এই খাত অক্লান্তভাবে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। লক্ষ্য ছিল একটাই– যত বেশি সম্ভব মানুষকে মোবাইল সংযোগের আওতায় আনা যায়। মোবাইল ফোন আজ চারদিকে দেখা যায়। কিন্তু ইউনিক মোবাইল সংযোগের হিসাব কষলে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। এখনও দেশের প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ সংযোগের বাইরে।

আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ মোবাইলে সংযুক্ত, এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্ত ভিত্তি বলে ধরে নেওয়া যায়। এর উপর দাঁড়িয়েই আমরা ভবিষ্যতের ডিজিটাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়তে পারি। তবে এখন শুধু সংযোগ নিয়ে ভাবলে চলবে না। ডেটা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। এটি শিল্পের পরবর্তী যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু শুধু ডেটার ভোক্তা হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের এখন ডিজিটাল সংযোগ থেকে প্রকৃত ভ্যেলু তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটাই-বৈশ্বিক উদ্ভাবনের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠা।



সেই কেন্দ্র গড়ে তোলার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় কী? অর্থনীতিকে ডিজিটাল করে তোলার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা। বৈশ্বিক পরিস্থিতির তুলনায় আমাদের অর্থনীতিকে এখনও গ্রিন ফিল্ড বললে ভুল বলা হবে না। একে সহজেই ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যায়। ডিজিটালাইজেশনের এই প্রক্রিয়া আমাদের তরুণদের সৃজনশীল শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে। কারণ ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ যত বাড়বে ততই বিপুল সংখ্যক তরুণ মেধার দরকার হবে। এভাবেই দেশ পাবে একদল দক্ষ তরুণ কর্মী। তারা প্রস্তুত থাকবে বৈশ্বিক বাজার জয় করতে।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির তুলনায় আমাদের অর্থনীতিকে এখনও গ্রিন ফিল্ড বললে ভুল বলা হবে না। একে সহজেই ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যায়। ডিজিটালাইজেশনের এই প্রক্রিয়া আমাদের তরুণদের সৃজনশীল শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে। কারণ ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ যত বাড়বে ততই বিপুল সংখ্যক তরুণ মেধার দরকার হবে।

তবে এসবের আগে একটি কাজ করা জরুরি-ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি দ্রুত দূর করা। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বাজেটে সরকার সিম ট্যাক্স তুলে দিয়েছে। এতে একটি বড় বাধা দূর হয়েছে। এখন সরকার যদি ডিভাইস কেনার খরচও অনেকটা কমাতে পারে তাহলে আমরা খুব দ্রুতই ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে সক্ষম হব।

এর পাশাপাশি আমরা চাই, সরকার টেলিকম খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিক। এ জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির নীলনকশা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই নীলনকশায় জাতীয় সংযোগ মহাপরিকল্পনা, ব্যান্ডউইথ রোডম্যাপ, ডেটা সেন্টারের মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা থাকা দরকার। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য হলো– এই নীলনকশা যতই সুচিন্তিত হোক না কেন, লাইসেন্সিং কাঠামো যথাযথ না হলে তা কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না।

লাইসেন্সিং কাঠামো ঠিক করার সময় আমাদের সতর্কভাবে ভাবতে হবে কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

...আমরা চাই, সরকার টেলিকম খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিক। এ জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির নীলনকশা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই নীলনকশায় জাতীয় সংযোগ মহাপরিকল্পনা, ব্যান্ডউইথ রোডম্যাপ, ডেটা সেন্টারের মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, এবং ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা থাকা দরকার।

ভোক্তার স্বার্থ? নাকি লাইসেন্সধারীরা কোন দেশের নাগরিক, সেই প্রশ্ন?

গত দুই দশক ধরে একটি প্রবণতা চলে আসছে– লাইসেন্সিং কাঠামো প্রণয়ন করার সময় সক্ষম বিনিয়োগকারীদের উপেক্ষা করা। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, তা অবাস্তবায়নযোগ্য স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে। ভোক্তার স্বার্থ যদি সত্যিই আমাদের অগ্রাধিকার হয় তাহলে এই ভুল করার সুযোগ আমাদের নেই।

টেলিকম ব্যবসার একটি বিশেষত্ব আছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই এই খাত বিদ্যমান। তাই এই খাতের কোনো উপাদানই বাংলাদেশের জন্য একেবারে নতুন বা ইউনিক নয়। এই ব্যবসার প্রতিটি দিকের সেরা বৈশ্বিক চর্চা কী সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

তাই নতুন করে চাকা আবিষ্কারের দরকার নেই। সঠিক লাইসেন্সিং কাঠামো থাকলে আমাদের শুধু একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে– নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি যেন বিনিয়োগবান্ধব হয়। সঠিক বিনিয়োগকারী এবং বিনিয়োগবান্ধব লাইসেন্সিং কাঠামো একসঙ্গে কাজ করলে আমরা দ্রুতই সঠিক পথে এগোতে পারব। এ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আইটিইউ রেগুলেটরি ম্যাচুরিটি ইনডেক্সে ভালো স্কোর করা এবং বৈশ্বিক মানের যেসব ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি রয়েছে তা দূর করা।

বৃহৎ পরিসরের রেগুলেটরি কাঠামো নতুন করে সাজানোর পর একটি কাজ জরুরি– নীতিগত সিদ্ধান্ত যেন কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। তবে এই খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য আরও একটি কাজ করা দরকার। আমাদেরকে গবেষণাভিত্তিক রেগুলেটরি সংস্কারের সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোনো অনুমাননির্ভর পদ্ধতিতে ফিরে গেলে তা নীতিগত লক্ষ্যগুলোকেই দুর্বল করে তুলবে।

সেবা প্রদান করতে কী পরিমাণ ব্যয় হবে সেই সিদ্ধান্ত এখন সরকারের হাতে। এই খাত থেকে সরকার রাজস্ব আহরণের বর্তমান পথেই চালিত হবেন কিনা তা তাদেরই ঠিক করতে হবে। ভোক্তা কর (৩৯ শতাংশ) এবং মোবাইল অপারেটরদের উপর প্রায় ৫৫ শতাংশ করের বোঝা– এই দুই ক্ষেত্রে কর যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস না করলে সমস্যা থেকেই যাবে। এই অবস্থায় তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে অপারেটরদের পক্ষে সেবার দাম কমানো খুবই কঠিন।

এই খাতে কার্যকর কর একদিকে যেমন বৈশ্বিক গড় করের দ্বিগুণ অপরদিকে গ্রাহকপ্রতি অপারেটরদের আয় (এআরপিইউ) মাত্র এক-সপ্তমাংশ। এমন পরিস্থিতিতে এই বাজারে দাতব্য বা চ্যারিটি ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন না। সরকার যদি এ বিষয়ে যদি সত্যই কার্যকর কিছু করতে চায় তাহলে বছর শেষে অনুষ্ঠিতব্য বড় পরিসরে যে স্পেকট্রাম নবায়ন করা হবে সে সময়ে উদ্যোগ নিতে পরে।

জিএসএমএ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল শেষে বাংলাদেশে চলমান আয়ের বিপরীতে স্পেকট্রাম ব্যয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১৫.৭ শতাংশে। এই অনুপাতের বৈশ্বিক মধ্যম মান মাত্র ৭.৭ শতাংশ। আর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ মান ১০.৪ শতাংশ।

অর্থাৎ, আমাদের অনুপাত বৈশ্বিক মধ্যম মানের দ্বিগুণেরও বেশি এবং এশিয়া

জিএসএমএ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল শেষে বাংলাদেশে চলমান আয়ের বিপরীতে স্পেকট্রাম ব্যয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১৫.৭ শতাংশে। এই অনুপাতের বৈশ্বিক মধ্যম মান মাত্র ৭.৭ শতাংশ। আর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ মান ১০.৪ শতাংশ

প্যাসিফিক অঞ্চলের তুলনায়ও অনেক বেশি। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দুই বছরের মধ্যে এই অনুপাত গিয়ে দাঁড়াবে ২২ শতাংশে। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে একটি বার্তা দিচ্ছে– আমরা একটি বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছি।

বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র প্রায় ৬.৫ শতাংশ। এই হতাশাজনক পরিসংখ্যান দেখে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি সরকারের রাজস্ব আহরণে টেলিকম খাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এখানে আরও একটি তথ্য প্রণিধানযোগ্য। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের অন্ধকার দিনগুলোতে যে কয়েক দিন ইন্টারনেট বন্ধ ছিল সেই সময়ে দেশের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিলে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়– এই খাতে অতিরিক্ত করের বোঝা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনলে সরকারই বরং বেশি লাভবান হবে।

টেলিকম খাত কি দেশের অসামঞ্জস্যপূর্ণ কর-জিডিপি অনুপাত সামাল দেওয়ার একটি হাতিয়ার হয়েই থাকবে, নাকি একে দেশের সুদৃঢ় ডিজিটাল স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার সুযোগ দেওয়া হবে? এই সিদ্ধান্ত সরকারেরই হাতে।

তবে আমরা যদি প্রকৃতই রেগুলেটরি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে আন্তরিক হই, তাহলে শুধু সুন্দর সুন্দর কথায় কাজ হবে না। আইটিইউ রেগুলেটরি ম্যাচুরিটি ইনডেক্সে অগ্রগতি না হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা কথাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, বাস্তবে রূপ নেবে না। আমরা যদি যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারি তাহলে একটি কার্যকর ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব যা দ্রুততম সময়ে রাষ্ট্রের জাতীয় কোষাগারের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে। এই পরিস্থিতিতে, যথাযথ পথ নির্বাচন এর আগে কখনো আমাদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি!

নিবন্ধ

বাংলাদেশে এরিকসনের ভূমিকা

সংযোগ সক্ষম করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া



আব্দুস সালাম
কান্ট্রি ম্যানেজার, এরিকসন বাংলাদেশ

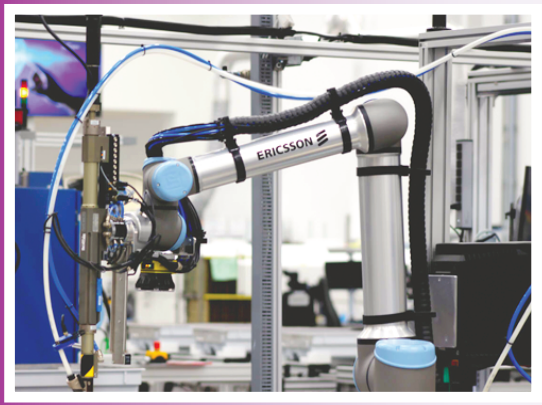
২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে বাংলাদেশে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৭০ লাখে, যা দেশের ডিজিটাল মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। এই সংযোগগুলিই তাৎক্ষণিক যোগাযোগ, নিরবচ্ছিন্ন ডেটা আদান-প্রদান এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে বদলে দিচ্ছে। এর মধ্যে ১১ কোটি ৯০ লাখ সংযোগ (প্রায় ৬৩.৬ শতাংশ) হ্যান্ডসেট ডিভাইসে ইন্টারনেট সুবিধা দিচ্ছে। এটি শুধু ফোনকলের বিষয় নয়; বরং সেন্সর, ব্যাংকিং সেবা, পাঠদান এবং বাজার সবকিছুই এখন মানুষের পকেটে চলে এসেছে। এটি এমন এক ব্যাপক পরিবর্তন, যা স্মার্টফোনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে ক্ষমতায়িত করছে। কৃষক, রিকশাচালক কিংবা ছোট দোকানদার, সবার কাছেই এটি এখন হাতের নাগালে।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সংযোগই ডিজিটাল রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি এবং আধুনিক অবকাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ। শক্তিশালী ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এখন অগ্রগতির প্রধান অনুঘটক, যা অর্থনীতিকে গতিশীল করছে এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়েও বেশি কার্যকরভাবে দূরত্বকে সংকুচিত করছে। সাশ্রয়ী ইন্টারনেট একসময় ছিল বিলাসিতা, কিন্তু এখন তা বিশ্ব ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে সক্রিয় অংশ নেওয়ার জন্য আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এই শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত ভিত্তি গড়ে তুলতে এরিকসন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে-টুজি থেকে ফাইভজি পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি স্থাপনে অংশ নিয়ে এমন একটি সেলুলার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে যা এখন দেশের ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষকে সেবা দিতে সক্ষম। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করে যে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি প্রায় সবার নাগালেই রয়েছে, যা বাংলাদেশকে সংযুক্তির এই যুগে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। গত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এরিকসন বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের একটি ভিত্তিস্তম্ভ হয়ে

আছে। নেটওয়ার্ক অবকাঠামো সরবরাহকারী থেকে শুরু করে এখন দেশের শক্তিশালী, নিরাপদ ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ার লক্ষ্যে এক আস্থাভাজন কৌশলগত অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

ফাইভজির মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সম্প্রসারণ

২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রথম বাণিজ্যিক ফাইভজি নেটওয়ার্ক চালু করে-এটি এক ঐতিহাসিক অর্জন, যেখানে এরিকসন ছিল মূল প্রযুক্তি অংশীদার। ফাইভজিতে রূপান্তর শুধু গতিবৃদ্ধির ধাপ নয়; বরং এটি এক যুগান্তকারী অর্জন, যা বিভিন্ন শিল্পখাতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। বাংলাদেশের জন্য এটি হবে এক "গেম চেঞ্জার"। এরিকসনের দৃষ্টিতে, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা মাত্র। এখন আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে যাচ্ছে-কীভাবে নেটওয়ার্কের আওতা বাড়ানো যায়, সেটি থেকে কীভাবে সংযোগকে উৎপাদনশীলতা, প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তর করা যায়, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। এই সংযোগ নেটওয়ার্কগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মূল স্তম্ভ হিসেবে জাতীয় অবকাঠামো বিনিয়োগের কেন্দ্রে রাখা উচিত।



সংযোগ ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

বিশ্ববাজারে ব্রডব্যান্ড সেবার অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে যা পরিমাপ করা যায়। মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা ব্যবহারে প্রতি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১.৫ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখতে পারে** (এরিকসন ও ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের অর্থনৈতিক প্রভাব গবেষণা: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/economic-impact-of-mobile-broadband)। এই প্রবৃদ্ধির উৎস হলো উন্নত তথ্য প্রবাহ, আরও দক্ষ বাজার, সময়ের অপচয় হ্রাস এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবার যে ইকোসিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে তা এখন প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। মোবাইল আর্থিক সেবা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৬ কোটিরও বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যার মোট মূল্য ১০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পেমেন্টসসিএমআই ফিনটেক ল্যান্ডস্কেপ বাংলাদেশ: https://www.paymentscmi.com/insights/fintech-landscape-bangladesh)। ডিজিটাল পেমেন্ট ছোট ব্যবসাগুলোকে আরও শক্তিশালী ও সক্ষম করে তুলেছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সুযোগ বাড়িয়েছে এবং বাণিজ্যকে আরও আনুষ্ঠানিক আকার দিয়েছে।



বাংলাদেশে একদিকে ফোরজি যেমন উন্নত হতে চলেছে তেমন ফাইভজি সেবার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরও উন্নত মানের ও নিরাপদ ডিজিটাল সেবা প্রদান এবং ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তি (ফাইভজি, এজ/ক্লাউড, এআই, আইওটি)-এর ব্যাপক ব্যবহার লজিস্টিকস, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা, উৎপাদন ও খুচরা খাতে নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট খরচ হ্রাস পেয়ে পণ্য বা সেবা আরও বেশি হাতের নাগালে নিয়ে আসবে। এই অগ্রগতি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যেমন-স্মার্ট পোশাক কারখানা (রোবোটিকস এবং মান নিয়ন্ত্রণ/রক্ষণাবেক্ষণে এআর প্রযুক্তি), বন্দর ও লজিস্টিকস (চট্টগ্রাম ও মংলায় রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং ও স্বয়ংক্রিয়করণ), নির্ভুল কৃষি (সেন্সরনির্ভর চাষাবাদ), স্বাস্থ্যসেবা (টেলিমেডিসিন ও ক্লিনিক্যাল আইওটি) এবং স্মার্ট সিটি ব্যবস্থা (যানজট, ইউটিলিটি ও নজরদারি)। এই পরিবর্তনগুলি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং জনসেবার মান উন্নত করবে।

সাশ্রয়ী সেবা প্রদানের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করলেও কাভারেজের চেয়ে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ হলো তার ব্যবহার। জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশি মোবাইল ব্রডব্যান্ডের আওতায় এলেও স্বচ্ছলতার অভাবে একটি বড় অংশ ইন্টারনেট ব্যবহারের বাইরে রয়েছে (জিএসএমএ স্টেট অফ মোবাইল ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ২০২৫: https://www.gsma.com/r/mobilefordevelopment/resources/state-of-mobile-internet-connectivity-report-2025/)।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো সাশ্রয়ী ডিভাইসের অপ্রাপ্যতা। অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে আমদানি শুল্ক, ভ্যাট এবং খাতনির্ভর কর স্মার্টফোনের বাজার মূল্যের ২০ থেকে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত হয় যা নিম্ন আয়ের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য এই ধরনের মৌলিক ডিভাইস দুর্লভ করে তোলে (বাংলাদেশের জন্য নীতি সংস্কার, ইউএনডিপি ও পিআরআই ২০২৪: https://www.undp.org/bangladesh/publications/policy-reforms-bangladesh)।

এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব:

- ৩০ থেকে ৬০ মার্কিন ডলার মূল্যের এন্ট্রি-লেভেল স্মার্টফোনের উপর কর হ্রাস তাকে সাশ্রয়ী করবে।
- স্থানীয়ভাবে ডিভাইস সংযোজন ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করবে ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশে সহায়ক হবে।
- ডেটা প্যাকেজের উপর ভ্যাট যৌক্তিক করা হলে তা নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারকে নিয়মিত করবে যা অনেকে অনিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন।

বাংলাদেশ যদি দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর বস্তবায়ন করতে চায় তাহলে সংযোগকে একদিকে সহজলভ্য করতে হবে অন্যদিকে আর্থিকভাবেও তা সবার নাগালে থাকতে হবে।

শিল্প সহযোগিতা ও বিনিয়োগ পরিবেশ

টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোকে এখন বিদেশি বিনিয়োগের একটি নির্ধারক উপাদান বলে বিবেচনা করা হয়। যেসব কোম্পানি উৎপাদন, লজিস্টিকস, আইটি সেবা বা রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে বিবেচনা করছে তারা ডিজিটাল অবকাঠামোর মান ও নির্ভরযোগ্যতাকে একটি মৌলিক শর্ত হিসেবে দেখছে।

বাংলাদেশের টেলিকম অপারেটর ও টাওয়ার কোম্পানিগুলো ফাইবার স্থাপনা, এনার্জি-সাশ্রয়ী সাইট আধুনিকীকরণ ও নেটওয়ার্কের মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবার মানের উপর জোর দিয়ে প্রতিযোগিতার অগ্রাধিকারকে নির্দেশ করে (সামেনা কাউন্সিল টেলিকম ডেইলি নিউজ ২০২৫: ssssss

শিল্পখাতগুলো যেমন ডিজিটাল রূপান্তর গ্রহণ করছে তেমনি সরকার, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ফাইভজি-উপযোগী কর্মশক্তি গড়ে তোলার সহযোগিতা জরুরি হয়ে পড়েছে। আইটি পেশাজীবী ও নিয়োগকর্তাদের পরিবর্তিত চাহিদার মধ্যে যে দক্ষতার ব্যবধান রয়েছে তা পূরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন তারা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতি ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর অগ্রগতিতে সরাসরি অবদান রাখতে পারে। এই লক্ষ্যে এরিকসন চালু করেছে এরিকসন এডুকেট প্রোগ্রাম, যা বিস্তৃত ডিজিটাল শিক্ষার উপকরণ, ফাইভজি প্রযুক্তি ও মানের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও ডিজিটাল সাফল্যের সনদ প্রদান করে। এরিকসন এখন এরিকসনএজএকাডেমিয়া প্রোগ্রাম ২.০-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করছে।

ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকারঃ সম্মিলিত অগ্রগতির এজেন্ডা

এরিকসন বাংলাদেশের টেকসই ডিজিটাল সাফল্যের জন্য চারটি কৌশলগত অগ্রাধিকার দেখছে:

১. ডিভাইসের উপর কর কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করা এবং স্থানীয় সংযোজন (এসেম্বলি) শিল্পকে উৎসাহিত করে স্মার্টফোনকে সবার জন্য সাশ্রয়ী করা।

২. ক্লাউড সেবা, ডিজিটাল শিক্ষা, টেলিমেডিসিন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতে উৎসাহ দানের জন্য নেটওয়ার্কের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩. ডিজিটাল সাক্ষরতা ও সেবা বিষয়ে সচেতনতা জোরদার করা যেন প্রকৃত ডিজিটাল অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

৪. সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ডেটা সুরক্ষা, অথেনটিকেশন ও ভোক্তা আস্থা প্রতিষ্ঠা করে ডিজিটাল আস্থার ভিত্তি মজবুত করা যায়।

উপসংহার

বাংলাদেশ ডিজিটাল যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সংযোগের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠান যেন ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে পারে, তা সাশ্রয়ী করতে পারে এবং এর সুফল ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতিনির্ধারক, টেলিকম অপারেটর, অবকাঠামো অংশীদার, আর্থিক সেবা প্রদানকারী, উদ্ভাবক এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তি নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে এই প্রক্রিয়ার অংশ।

বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুযোগের পরিধি সম্প্রসারণ এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি সংযুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এরিকসন বাংলাদেশের পাশে থেকে কাজ করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির পথে

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জাতীয় রূপকল্প বাস্তবায়নে এজেন্টিক এআই প্রযুক্তির ব্যবহার

স্মার্ট, সঞ্চয়ী ও মানসম্পন্ন
টেলিকম সেবার প্রতিশ্রুতি
বাস্তবায়ন ও গ্রাহক অভিজ্ঞতার
সম্পূরক স্তর বিনির্মাণ

মাযহারুল ইসলাম
কান্ট্রি ডিরেক্টর, কোয়ান্টেল বাংলাদেশ লিমিটেড



বিগত প্রায় এক দশক ধরে টেলিকম অপারেটররা গ্রাহকদের আরও স্মার্ট সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি; বরং সেবার প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান গ্রাহকদের আরও হতাশ করেছে।

এবারের জাতীয় বাজেটে অন্তত একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমেছে। তবে বাস্তবতা হলো, যে গ্রাহক মাসে ১০০ টাকারও কম ব্যয় করেন, বর্তমান ব্যয় কাঠামোতে তাকে সেবা দিতে গিয়ে অধিকাংশ অপারেটরেরই লোকসান হয়। এমন লাখ লাখ নিম্ন আয়ের নতুন গ্রাহক যুক্ত হলে সংযোগের সংখ্যা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধিই ধীরে ধীরে অপারেটরদের বিনিয়োগ সক্ষমতাকে ক্ষয় করে, যা পুরো ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

এর সমাধান নিম্ন আয়ের মানুষের উপর অতিরিক্ত মূল্য চাপিয়ে দেওয়া নয় বরং এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে তাদের সেবা দেওয়ার ব্যয় এতটাই কম হবে যে তারাও লাভজনক গ্রাহকে পরিণত হবেন। এর অর্থ হলো সিম নিবন্ধন, অফার নির্বাচন, গ্রাহক সহায়তা থেকে শুরু করে পুরো বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকে এমনভাবে স্বয়ংক্রিয় করা, যাতে অধিকাংশ কাজেই মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না হয়। তখন সবচেয়ে কম ব্যয়কারী গ্রাহককেও সেবা দেওয়ার খরচ নেমে আসবে এবং নিম্ন আয়ের গ্রাহক বৃদ্ধি অপারেটরদের জন্যও লাভজনক প্রবৃদ্ধিতে রূপ নেবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, তার প্রথম বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাবে কেবল চ্যাটবটে নয়, বরং পেছনে নীরবে কাজ করা এই স্বয়ংক্রিয় বাণিজ্যিক অবকাঠামোতে।

যিনি কখনও বিল সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য টেলিকম চ্যাটবট ব্যবহার করেছেন, তিনি সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা জানেন। আপনি সমস্যাটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু উত্তর আসে কিছু নির্ধারিত অপশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে, যা আপনার সমস্যার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কোন মানব এজেন্টের সহায়তার প্রতিশ্রুতিও অনেক সময় পূরণ হয় না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে যেতে হয়। বহু বছর ধরে এটিই ছিল শিল্পখাতের তথাকথিত 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'–যেখানে ছিল না প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, ছিল না প্রকৃত সেবার সমাধান।

তাই যখন কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য এআই নিয়ে কথা বলেন, তখন সংশয় তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এবার পার্থক্যটি মৌলিক যা একটি শব্দেই ব্যাখ্যা করা যায়-আগের সিস্টেম শুধু উত্তর দিত, নতুন সিস্টেম কাজ সম্পন্ন করে। জটিল প্রযুক্তিগত ভাষা পরিহার করে বলা যায় এটাই এজেন্টিক এআই-এর মূল দর্শন। প্রচলিত চ্যাটবট কেবল তথ্য বা উত্তর খুঁজে দেয়। কিন্তু একটি এজেন্ট নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। ধরুন, আপনি এমন একটি মোবাইল প্যাকেজে যেতে চান, যা আপনার ব্যবহার-প্যাটার্নের সঙ্গে সত্যিই মানানসই। প্রচলিত ব্যবস্থায় আপনাকে হয়তো একটি লিংক দেওয়া হবে। কিন্তু এজেন্টিক এআই তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ব্যবহারের তথ্য বিশ্লেষণ করবে, উপযুক্ত প্যাকেজ নির্বাচন করবে, সেটি চালু করবে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

একইভাবে এটি অপ্রয়োজনীয় কোনো সাবস্ক্রিপশন বাতিল করতে পারে, বকেয়া রিফান্ডের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে কিংবা গত মঙ্গলবার কেন আপনার ডাটা সংযোগে সমস্যা হয়েছিল তা শনাক্ত করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে–কোনো সারিতে অপেক্ষা না করেই। জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় অপারেটররা ইতোমধ্যেই বাস্তব নেটওয়ার্কে প্রকৃত গ্রাহকদের জন্য এ ধরনের এজেন্ট ব্যবহার করছে। অর্থাৎ এই প্রযুক্তি পরীক্ষাগারের গ-ি পেরিয়ে বাস্তব প্রয়োগের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যখন অনেকে এখনও এটিকে কেবল একটি প্রদর্শনীযোগ্য প্রযুক্তি বলেই ভাবছেন।

কিন্তু বিষয়টি কেন শুধু একটি উন্নত গ্রাহকসেবা ব্যবস্থার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ? বাংলাদেশে এখন মোবাইল সংযোগ বিক্রির ব্যবসায় পার্থক্য তৈরির সুযোগ দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। বিশ্বের অন্যতম সাশ্রয়ী মোবাইল ডাটা সেবা আমরা ইতোমধ্যেই দিচ্ছি। ফাইভজি সামনে আসছে, কিন্তু শুধুমাত্র দ্রুতগতির ভিডিও স্ট্রিমিং কোনো অপারেটরের নেটওয়ার্ককে অন্যটির তুলনায় সাধারণ গ্রাহকের কাছে আলাদা করে তুলবে না। যখন নেটওয়ার্ক নিজেই একটি সাধারণ পণ্যে (Commodity) পরিণত হয় এবং মূল্য নির্ধারণের সুযোগও সীমিত থাকে, তখন প্রতিযোগিতার একমাত্র ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় গ্রাহকের অভিজ্ঞতা (Customer Experience)।

সব অপারেটরই এটি উপলব্ধি করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো–উন্নত গ্রাহকসেবা ব্যয়বহুল। যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাহক মাসে ১০০ টাকারও কম ব্যয় করেন, সেখানে কোটি কোটি গ্রাহককে মানসম্মত সেবা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত মানবসম্পদ নিয়োগ করা আর্থিক দিক থেকে সম্ভব নয়। ফলে অসন্তুষ্ট গ্রাহক এখন আর অভিযোগ করেন না; বরং দ্রুতই অন্য অপারেটরে স্থানান্তর করেন এবং তার অসন্তোষ আরও অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেন। বাজারে এই নীরব গ্রাহক হারানোই অপারেটরের সবচেয়ে বড় ব্যয়ে পরিণত হয়।

এজেন্টিক এআই প্রথম প্রযুক্তি যা দীর্ঘদিনের এই সমীকরণ বদলে দিতে পারে। এটি একটি এআই এজেন্ট যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। পরিচালন ব্যয় খুবই কম এবং রাত দুইটাতেও একই দক্ষতায় কাজ করতে পারে। এর ফলে কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকও একই মানের সেবা পেতে পারেন যা একসময় উচ্চমূল্যে কেবল বড় করপোরেট গ্রাহকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং বাণিজ্যিকভাবে ছিল টেকসই। আসল গল্পটি এখানেই। স্বয়ংক্রিয় নেটওয়ার্ক বা সিক্সজি নিয়ে যত আলোচনা হয় তার আড়ালে এই বাস্তব পরিবর্তনটি অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। এই প্রযুক্তির প্রকৃত শক্তি তার বুদ্ধিমত্তায় নয়; বরং এটি প্রতিটি গ্রাহককে মানসম্মত সেবা দেওয়াকে একই সঙ্গে সাশ্রয়ী ও সম্প্রসারণযোগ্য (Scalable) করে তোলে।

তবে এই পরিবর্তন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হলে ঝুঁকিও কম নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু সঠিক বিচক্ষণতা নেই–এমন একটি এজেন্ট সাধারণ চ্যাটবটের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। কল্পনা করুন, একটি এজেন্ট ভুলবশত হাজারো গ্রাহককে ভুল রিফান্ড দিয়ে ফেলেছে অথবা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল তথ্য প্রচার করছে। তাই এই রূপান্তরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এজেন্ট তৈরি করা নয়; বরং তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে তারা কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কোথায় অবশ্যই মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে এবং বিশেষকরে গ্রাহকের আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্য অডিট ট্রেইল কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে–এসব বিষয় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো এই বিষয়টিকে সবসময় সমান গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আছে, তারা সবাই একটি বিষয়েই একমত–উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনোই সমস্যা ছিল না; প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো নিয়ন্ত্রণ।

এখানেই একটি আধুনিক, নমনীয় ও কার্যকর বিজনেস সাপোর্ট সিস্টেম অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রচলিত, বিচ্ছিন্ন এবং অনমনীয় BSS প্ল্যাটফর্মগুলো এজেন্টিক এআই পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রিয়েল-টাইম তথ্য, নমনীয় ওয়ার্কফ্লো এবং সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিতে সক্ষম নয়। একটি আধুনিক ইঝঝ পুরো বাণিজ্যিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এটি এআই এজেন্টকে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক গ্রাহক তথ্য, বিলিং ইতিহাস এবং সেবার অধিকারসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে। একই সঙ্গে নিশ্চিত করে যে কোনো এজেন্ট যখন প্যাকেজ পরিবর্তন, রিফান্ড বা অন্য কোনো পদক্ষেপ নেবে তখন সেটি নির্ধারিত নীতিমালার মধ্যেই হবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান ও অডিটযোগ্য থাকবে। এ ধরনের শক্তিশালী ইঝঝ ছাড়া এজেন্টিক এআই একটি সম্পদে পরিণত হওয়ার বদলে বরং ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং বুদ্ধিমান ও নিরবচ্ছিন্ন সেবার যে প্রতিশ্রুতি, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

তাই আজ যখন শিল্পখাতের নেতারা টেলিকম কোম্পানি থেকে 'টেককো' (Techco)-তে রূপান্তরের কথা বলেন তখন প্রকৃত পরিবর্তনটি লুকিয়ে আছে এই অভ্যন্তরীণ রূপান্তরেই। এটি নতুন কোনো অ্যাপ স্টোর চালু করা বা নতুন লোগো উন্মোচনের বিষয় নয়। বরং এটি হলো মোবাইল সেবার অন্তর্নিহিত পুরো বাণিজ্যিক কাঠামোকে নতুনভাবে গড়ে তোলা যাতে একজন গ্রাহক–তিনি যেই হোন না কেন, যত কম ব্যয়ই করুন না কেন সবসময় দ্রুত, নির্ভুল এবং মানবিক অভিজ্ঞতার কাছাকাছি সেবা পান। যেসব অপারেটর আধুনিক BSS-এর সঙ্গে এজেন্টিক এআই-এর কার্যকর সমন্বয় করতে পারবে আগামী বছরগুলোতে তারাই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে। তাদের সাফল্যের মূল কারণ সবচেয়ে বুদ্ধিমান এআই ব্যবহার করা নয়; বরং সেই বুদ্ধিমত্তাকে কৌশলগতভাবে গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নয়নে কাজে লাগানো। শুধুমাত্র ব্যয়হ্রাস বিবেচ্য নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ ইতোমধ্যেই এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে এমন একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে উঠতে পারে যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ১৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে। একই সঙ্গে তিনি এমন একটি পূর্বাভাসের কথাও উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে–২০২৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। আজ আমাদের সামনে এমন এক সুযোগ এসেছে, যা আগে কখনো ছিল না। রয়েছে সুস্পষ্ট জাতীয় রোডম্যাপ, দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত ধারাবাহিকতা, বাস্তব অবকাঠামো নির্মাণের গতি এবং এমন একটি ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা যা ওয়ালেট ও ব্যাংকের মধ্যে অর্থ প্রবাহকে অবশেষে নির্বিঘ্ন করেছে। এ ধরনের সুযোগ বারবার আসে না। এই পুরো আলোচনাকে যদি একটি মাত্র কথায় বলতে হয়, তবে তা হলো-যার হাতে সাশ্রয়ী ফোন আছে, তার জন্যই সব গড়তে হবে। কারণ সেই মানুষটাই আমাদের অর্থনীতি, আর তিনিই আমাদের নাগরিক। আমাদের সব উদ্যোগ যদি তার কাছে পৌঁছানো না যায়, তবে সেই অগ্রগতিকে প্রকৃত অর্থে সফল বলা যাবে না।

অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট অনেক বেশি ব্যয়বহুল

নূর মিয়াজী, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা



নেটওয়ার্কের মান সব জায়গায় একরকম নয়। অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, ভবনের কাঠামো এবং নেটওয়ার্কের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে গতির তারতম্য হতে পারে। পেনসিলভানিয়াতেও তিনি মাঝে মাঝে ধীরগতির ইন্টারনেটের সম্মুখীন হয়েছেন। কিছু ভূগর্ভস্থ টানেলেও সংযোগ পাওয়া যায়, তবে এটি সংশ্লিষ্ট স্থানের অবকাঠামো ও মোবাইল কভারেজের উপর নির্ভর করে। কিছু এলাকায় সংযোগজনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

"আমার অভিজ্ঞতায়, বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবার মাসিক খরচ এখনো অনেক বেশি। শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা এটাই। আমি এবং পরিবারের আরও তিন সদস্যের মোবাইল সেবার জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১৫০ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ১৮ হাজার টাকা, বিনিময় হার অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে) ব্যয় করি," বলেন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী নূর মিয়াজী।

তিনি বলেন, তাদের ব্যবহৃত ফ্যামিলি প্ল্যানে পরিবারের সবাই আনলিমিটেড কল, এসএমএস এবং ডেটা সুবিধা পান। তবে আন্তর্জাতিক কল অনেক সময় অতিরিক্ত চার্জের আওতায় পড়ে, যদিও কিছু প্ল্যানে নির্দিষ্ট কিছু দেশের জন্য বিশেষ সুবিধাও থাকে। অপারেটরগুলো আন্তর্জাতিক রোমিং সেবা প্রদান করে এবং এতে অতিরিক্ত খরচের বিনিময়ে বিভিন্ন স্ট্রিমিং সেবাও যুক্ত করা যায়। সমুদ্রপথে ভ্রমণের সময়ও সংযোগ পাওয়া সম্ভব, তবে সেটি সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্কের পরিবর্তে জাহাজভিত্তিক স্যাটেলাইট সেবার মাধ্যমে হয় এবং এর খরচ অনেক বেশি।

কনেকশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নূর মিয়াজী বলেন, "ফাইভজি চালু হওয়ার পর থেকেই আমি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। এটি নিঃসন্দেহে আগের প্রযুক্তির তুলনায় দ্রুত এবং অধিক সক্ষম। কল, মেসেজ, ভিডিও স্ট্রিমিং কিংবা অনলাইন গেমিংয়ে সাধারণত কোনো সমস্যা হয়

"বাংলাদেশে থাকাকালে নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে মাঝে মাঝে কল ড্রপের অভিজ্ঞতা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় কখনো কখনো এমন সমস্যা দেখা দেয়, তবে তুলনামূলকভাবে কম। এখানে ভয়েস কলের মান সাধারণত খুবই পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ জনবহুল এলাকায় এখন ফাইভজি কভারেজ বিদ্যমান, যদিও এর পরিধি ও গতি অপারেটর ও এলাকার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।"

অফিসের অনেক দৈনন্দিন কাজও মোবাইল ফোন থেকেই সম্পন্ন করি এবং বেশিরভাগ সময় কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হই না।"

তিনি বলেন, "আমার অভিজ্ঞতায়, ফাইভজি ও এলটিই (LTE) নেটওয়ার্ক আগের প্রজন্মের প্রযুক্তির তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল।" তবে তিনি যুক্ত করেন, নেটওয়ার্কের মান সব জায়গায় একরকম নয়। অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, ভবনের কাঠামো এবং নেটওয়ার্কের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে গতির তারতম্য হতে পারে। পেনসিলভানিয়াতেও তিনি মাঝে মাঝে ধীরগতির ইন্টারনেটের সম্মুখীন হয়েছেন। কিছু ভূগর্ভস্থ টানেলেও সংযোগ পাওয়া যায়, তবে এটি সংশ্লিষ্ট স্থানের অবকাঠামো ও মোবাইল কভারেজের উপর নির্ভর করে। কিছু এলাকায় সংযোগজনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের মোবাইল বাজার সম্পর্কে তিনি বলেন, "এখানে এটিঅ্যান্ডটি, টি-মোবাইল এবং ভেরাইজনের মতো বড় অপারেটরগুলো দেশজুড়ে বিস্তৃত সেবা প্রদান করে। এছাড়া অনেক এমভিএনও (Mobile Virtual Network Operator) রয়েছে, যারা এসব বড় অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কম খরচে সেবা দেয়।" তিনি আরও বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে পোস্টপেইড মোবাইল সংযোগ নিতে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর (Social Security Number) বা ক্রেডিট যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। তবে প্রিপেইড সংযোগের ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয় না। অনেক গ্রাহক উন্নত কভারেজ, গ্রাহকসেবা এবং অতিরিক্ত সুবিধার কারণে বড় অপারেটরগুলোকে বেছে নেন। অন্যদিকে, অনেক এমভিএনও প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কল ও মোবাইল সেবায় তুলনামূলকভাবে কম খরচে ভালো বিকল্প প্রদান করে।"

মোবাইল অপারেটররা ব্রডব্যান্ড সেবাও দেয় কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে নূর মিয়াজী বলেন, "হ্যাঁ, ভেরাইজন, টি-মোবাইল এবং ইউএসসেলুলারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ফিক্সড ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করে। পাশাপাশি অনেক এলাকায় ভেরাইজন ফাইবারভিত্তিক সেবাও দিয়ে থাকে। বাসাবাড়ির ইন্টারনেট সংযোগে সাধারণত একটি গেটওয়ে ডিভাইস দেওয়া হয়, যা একই সঙ্গে মডেম ও রাউটারের কাজ করে।"

বাংলাদেশে মোবাইল সেবা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তাঁর মতে, ব্যবহারকারীরা এখনো কিছু এলাকায় কল ড্রপ ও দুর্বল ডেটা সংযোগের সমস্যার মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, "শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা গেলে নেটওয়ার্কের মান আরও উন্নত হবে, কল ড্রপ কমবে এবং ডেটা সেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন ডেটা সংযোগ দেশের ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।" বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে থাকাকালে নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে মাঝে মাঝে কল ড্রপের অভিজ্ঞতা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় কখনো কখনো এমন সমস্যা দেখা দেয়, তবে তুলনামূলকভাবে কম। এখানে ভয়েস কলের মান সাধারণত খুবই পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ জনবহুল এলাকায় এখন ফাইভজি কভারেজ বিদ্যমান, যদিও এর পরিধি ও গতি অপারেটর ও এলাকার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।"

কানাডায় নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত সমস্যা একটি সাধারণ বিষয়, বিশেষকরে দুর্গম বা পাহাড়ি এলাকায়

শবনম সায়েমা, কানাডা প্রবাসী

"বাংলাদেশে থাকাকালে মোবাইল ব্যবহারের জন্য মাসে কখনোই এক হাজার টাকার বেশি খরচ করতে হতো না। কিন্তু কানাডায় আমাদের তিন সদস্যের পরিবারের মোবাইল খরচ মাসে প্রায় ২০০ কানাডিয়ান ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৮ হাজার টাকার সমান," বলেন টরন্টোপ্রবাসী শবনম সায়েমা।

এক দশক আগে বাংলাদেশ ছেড়ে কানাডায় পাড়ি জমানো শবনম বলেন, "আমি খুব বেশি মোবাইল সেবা ব্যবহার করি না। আমার বর্তমান প্যাকেজে আনলিমিটেড ডাটা রয়েছে। আমার স্বামীর প্যাকেজে ২০ জিবি এবং মেয়ের প্যাকেজে ১০ জিবি ডাটা আছে। আগের প্যাকেজে ১০০ মিনিট আন্তর্জাতিক কলের সুবিধা ছিল, নতুনটিতে তা নেই। তবে দেশজুড়ে আনলিমিটেড কল ও এসএমএস পাওয়া যায়।"

দুই দেশের মোবাইল সেবার তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, কানাডায় মোবাইল সেবা মূলত মাসিক প্যাকেজভিত্তিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কলের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সীমা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ফলে প্রতিদিন কত ডাটা বা মিনিট ব্যবহার হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবতে হয় না। অন্যদিকে বাংলাদেশে থাকাকালে ডাটা ও কল মিনিট ব্যবহারের হিসাব সবসময় মাথায় রাখতে হতো। তবে কানাডায় নেটওয়ার্কের মান অনেকাংশে অবস্থানভেদে পরিবর্তিত হয়। অপরদিকে বাংলাদেশে কখনো কখনো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতো।

"উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্যাসপে অঞ্চলে ভ্রমণের সময় আমার মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি আমি তখনও কানাডার ভেতরে থাকলেও রোমিং চার্জের বার্তা দেখাচ্ছিল। প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াতের সময়ও আমি জানি কোন কোন এলাকায় সিগন্যাল দুর্বল থাকে, কারণ আমি পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করি যেখানে কভারেজ সব জায়গায় সমান নয়। যদিও কানাডার বড় শহরগুলোর নেটওয়ার্ক কভারেজ বাংলাদেশের শহরগুলোর তুলনায় ভালো, তবুও সামগ্রিকভাবে টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আমাকে মুগ্ধ করে।"



নেটওয়ার্ক সেবার পাশাপাশি কানাডায় মোবাইল ফোন কেনার কিস্তিভিত্তিক সুবিধাকেও তিনি ইতিবাচক হিসেবে দেখেন। তাঁর ভাষায়, "এখানে ডিভাইস ফাইন্যান্সিং খুবই প্রচলিত। উদাহরণ হিসেবে, মেয়ের আইফোনের জন্য আমরা মাসে ৪৫ কানাডিয়ান ডলার এবং স্বামীর পিক্সেল ফোনের জন্য ৩৫ কানাডিয়ান ডলার পরিশোধ করি। বাংলাদেশেও যদি এ ধরনের সুবিধা আরও ব্যাপক-ভাবে চালু হতো, তাহলে আমি খুশি হতাম।"

নেটওয়ার্ক কভারেজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শবনম বলেন, কানাডা ভৌগোলিকভাবে বিশাল একটি দেশ। ফলে বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি এলাকায় নেটওয়ার্ক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তিনি বলেন, "উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্যাসপে অঞ্চলে ভ্রমণের সময় আমার মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি আমি তখনও কানাডার ভেতরেই থাকলেও রোমিং চার্জের বার্তা দেখাচ্ছিল। প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াতের সময়ও আমি জানি কোন কোন এলাকায় সিগন্যাল দুর্বল থাকে, কারণ আমি পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করি যেখানে কভারেজ সব জায়গায় সমান নয়। যদিও কানাডার বড় শহরগুলোর নেটওয়ার্ক কভারেজ বাংলাদেশের শহরগুলোর তুলনায় ভালো, তবুও সামগ্রিকভাবে টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আমাকে মুগ্ধ করে।"

শবনমের মতে, কানাডার টেলিযোগাযোগ বাজার মূলত দুটি বড় অপারেটর– বেল এবং রজার্স– কেন্দ্রিক। অন্যান্য অনেক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানও তাদের নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। ফলে গ্রাহকদের সামনে বিকল্প তুলনামূলকভাবে কম।

তিনি বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কোনো বড় ধরনের নেটওয়ার্ক সমস্যা দেখা দিলে অফিসের কাজ থেকে শুরু করে হাসপাতালের সেবাও ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে আমি যখন থাকতাম, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ কাগজভিত্তিক বা সরাসরি যোগাযোগের উপর নির্ভর করত। সব কিছু অনলাইনে ছিল না, তাই নেটওয়ার্ক সমস্যা হলেও পুরো ব্যবস্থা থমকে যেত না।"

দুই দেশের অভিজ্ঞতার তুলনা করতে গিয়ে শবনম আরও বলেন, বাংলাদেশে থাকাকালে তিনি কল ড্রপের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কানাডায় এ ধরনের অভিজ্ঞতা খুব কম। তাঁর জানা মতে, কানাডার অধিকাংশ নেটওয়ার্ক এখন ফাইভজি প্রযুক্তিনির্ভর। তবে তারপরও গ্রাহকদের অভিযোগ নেই, এমন নয়।

তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব বড় পার্থক্য অনুভব করি না। হয়তো বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করার মতো যথেষ্ট তথ্য বা অভিজ্ঞতা আমার নেই।"

তিনি আরও একটি অবকাঠামোগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলো প্রধানত মোবাইল বা বেতার সেবা প্রদান করে, আর কানাডার অপারেটররা একই সঙ্গে মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড–উভয় সেবাই দিয়ে থাকে।

শবনম বলেন, "রজার্স ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেয়। আমি বেল ব্যবহার করি, যারা আমার জানা মতে ফাইবার অপটিক সংযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট সরবরাহ করে।"

নেটওয়ার্ক সেবার পাশাপাশি কানাডায় মোবাইল ফোন কেনার কিস্তিভিত্তিক সুবিধাকেও তিনি ইতিবাচক হিসেবে দেখেন।

তাঁর ভাষায়, "এখানে ডিভাইস ফাইন্যান্সিং খুবই প্রচলিত। উদাহরণ হিসেবে, মেয়ের আইফোনের জন্য আমরা মাসে ৪৫ কানাডিয়ান ডলার এবং স্বামীর পিক্সেল ফোনের জন্য ৩৫ কানাডিয়ান ডলার পরিশোধ করি। বাংলাদেশেও যদি এ ধরনের সুবিধা আরও ব্যাপকভাবে চালু হতো, তাহলে আমি খুশি হতাম।"

সবশেষে বাংলাদেশের মোবাইল সেবা খাত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে শবনম বলেন, "বাংলাদেশ যোগাযোগসেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিতে পেরেছে–এটা ভেবে আমি গর্ববোধ করি। আমার মতে, দেশের মোবাইল অপারেটরগুলো ভালো কাজ করছে। বড় শহরগুলোতে সেবার মান আরও উন্নত করা উচিত এবং একই সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা যেন সাশ্রয়ী থাকে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।"



বাংলালিংক তাদের গুইখ অ্যাপে ডাক্তারের পরামর্শ, ওষুধ সরবরাহ, ল্যাব টেস্ট ও বীমাসহ বিভিন্ন ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা যুক্ত করতে সম্প্রতি CliniCall লিমিটেডের সঙ্গে একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদন করে। টাইগার্স ডেনে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির উদ্দেশ্য দেশজুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ করা। এ উপলক্ষে বাংলালিংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চিফ ডিজিটাল অফিসার গোলাম কিবরিয়া, চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান এবং গ্রোথ অ্যান্ড এনগেজমেন্ট ডিরেক্টর রফিক আহমেদ। অন্যদিকে ক্লিনিকলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ অপারেটিং অফিসার পারভেজ আহমেদ এবং হেড অব টেকনোলজি শাবা শামস।



বাংলালিংক মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে সম্প্রতি উইনরক ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছে। এ উপলক্ষে বাংলালিংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান এবং সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ডিরেক্টর মুহাম্মদ মেহেদী হাসান। উইনরক ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর দীপ্ত রক্ষিত।



গ্রামীণফোন বোর্ড সদস্যরা সম্প্রতি রাজশাহী জেলা পরিদর্শন করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল টেলিনর ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়িত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করা এবং তা মানুষের জীবনে কীভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনছে তা উপলব্ধি করা। ২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই যৌথ উদ্যোগ ইতিমধ্যে প্রায় ৩৩ লাখ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা ও অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও তরুণ সমাজ; নিরাপদে ডিজিটাল দুনিয়ায় বিচরণের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন। এর ফলে তারা সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ সেবা এবং নতুন নতুন সুযোগের সন্ধান পাচ্ছেন।



গ্রামীণফোন একাডেমিক– গ্রামীণফোনের বিনামূল্যের দক্ষতা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম সম্প্রতি তৃতীয় বছরে পা রেখেছে। দেশজুড়ে ১৬৭টির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত এই কার্যক্রমে ১ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছেন এবং মোট ভর্তির সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার। ফেসবুক কমিউনিটিতে সক্রিয় সদস্য রয়েছেন ১৫ হাজারেরও বেশি, যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬ হাজার। এর ফ্রিল্যান্সিং ব্যাচের শিক্ষার্থীরা মাত্র এক বছরে সম্মিলিতভাবে আয় করেছেন ৫৬ হাজার ডলার, আর এই ব্যাচ থেকেই দুইজন উদ্যমী শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজস্ব এজেন্সি– ওয়েবভিশনিয়ার (Webvissioneer) ও বিল্ডসাইন (BuildSign)। সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয় হলো, এই ব্যাচেরই ১৩ জন শিক্ষার্থী মাত্র এক বছরের শেখার অভিজ্ঞতা দিয়েই আয় করেছেন ১০০০ ডলারের বেশি, যাদের মধ্যে দুইজনই নারী শিক্ষার্থী।



রবি আজিয়াটা পিএলসি ও ওয়াটারএইড বাংলাদেশ সম্প্রতি বাংলাদেশে জল ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এগিয়ে নিতে এবং বিশেষত দেশের প্রধান রেলস্টেশনগুলোতে নিরাপদ পানীয় জলের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে একটি কৌশলগত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। ঢাকায় রবির করপোরেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান এবং ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল সার্ভিসেস মো. তাহমিদুল ইসলাম। রবি আজিয়াটা পিএলসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটি ডিরেক্টর শরীফ শাহ জামাল রাজ এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।



রবি আজিয়াটা পিএলসি সম্প্রতি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হাতে বিশেষ স্মার্ট কেইন তুলে দিয়েছে যা তাদের দৈনন্দিন চলাফেরাকে আরও নিরাপদ ও সহজ করবে। দৃষ্টি টেকনোলজিস উদ্ভাবিত এই "অভাস স্মার্ট কেইন"-এ ব্যবহৃত হয়েছে সোনার-ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চলার পথে বিভিন্ন বাধা আগেভাগেই শনাক্ত করতে পারবেন। ঢাকায় রবির করপোরেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই স্মার্ট কেইন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবি আজিয়াটা পিএলসির চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটি ডিরেক্টর শরীফ শাহ জামাল রাজ, দৃষ্টি টেকনোলজিস লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রিদওয়ান হোসেনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।



এরিকসন বাংলাদেশ সম্প্রতি ঢাকার একটি হোটেলে সকল কর্মীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করে।



এরিকসন বাংলাদেশ সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানস্থ কার্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করে। এতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।



দেশের আইসিটি খাতের তরুণ মেধাবীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এ ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট কর্মসূচির আয়োজন করে হুয়াওয়ে। এই কর্মসূচিতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এমসিকিউভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। নির্বাচিত এই মেধাবী গ্র্যাজুয়েটদের হুয়াওয়েতে সরাসরি ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দেওয়া হবে, যা তাদের আন্তর্জাতিক মানের কর্মপরিবেশে জ্ঞান প্রয়োগ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।



বাংলাদেশে ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, হুয়াওয়ে তার 'আইসিটি পার্টনার এনাবলমেন্ট প্রোগ্রাম' চালু করেছে। ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে পার্টনাররা তাদের কারিগরি দক্ষতাকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। প্রকৌশলী ও পেশাদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফল এই উদ্যোগটি আইসিটি খাতের উদ্ভাবনী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।



কোয়ান্টেল টিম বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করে।



কোয়ান্টেল বাংলাদেশের কোম্পানি রিট্রিট ২০২৫।



এমটব-এর একটি প্রতিনিধিদল গত ফেব্রুয়ারিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম, এমপি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রবি আজিয়াটা পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াদ সাতারা, বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়োহান বুসে, গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান, এমটবের মহাসচিব লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.), বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান, গ্রামীণফোনের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার তানভীর মোহাম্মদ, রবি আজিয়াটার চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলমসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।



এমটবের মহাসচিব লে. কর্নেল মোহাম্মদ জুলফিকার (অব.) সম্প্রতি "নতুন টেলিকম নীতিমালা: উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

তড়িৎ চৌম্বকীয় রেডিয়েশনের প্রভাব

যদিও রাডার, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য উৎস হতে নিঃসৃত ননআয়োনাইজিং রেডিয়েশনের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে অনেক গবেষণা করা হয়েছে, এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

■ ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাইন্টিফিক কমিটি অন হেলথ ইফেক্টস অফ এক্সপোজার টু ইএমএফ

ইএমএফ রেডিয়েশনের মূল শরীরবৃত্তীয় প্রভাব হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি। মোবাইল ফোন বা মোবাইল টাওয়ার হতে নির্গত ইএমএফ রেডিয়েশনের প্রভাব এতই কম মাত্রার যে সাধারণভাবে তা পরিমাপ করা যায় না। এটি ছাড়া অন্য কোন ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রভাব নেই।

টাওয়ার স্থাপিত ভবনে কি বেশি মাত্রার রেডিয়েশন হয়? উত্তর- না। বরং এন্টেনার সিগনাল প্রপাগেশন, উচ্চতা এবং দূরত্ব বিবেচনায় টাওয়ারের নিচের বিল্ডিং এ খুব কম ইএমএফ (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড) রেডিয়েশন নির্গত হয়। সুতরাং হাসপাতাল, অফিস, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি ভবনে নিশ্চিন্তে টাওয়ার স্থাপন করা যেতে পারে।

জীবজন্তু বা উদ্ভিদের উপর ইএমএফ (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড) রেডিয়েশনের কোন প্রভাব প্রমাণিত নয়।

■ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা


TV


LAPTOP


AIR COOLER


REFRIGERATOR


ROUTER


MOBILE TOWER

যে সমস্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে ইএমএফ রেডিয়েশন নির্গত হয়। নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশন - এতে অণুর গঠন ভাংগার মতো যথেষ্ট শক্তি নিহিত থাকে না।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা: প্রাসাদ ট্রেড সেন্টার (১০ম তলা),
৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
ফোন: +০৯৬৩৮০২৬৮৬২ ও ০২ ২২২২৮৪৩৩৪৪। ফ্যাক্স: +০২২২২২৬৩১২১
ইমেইল : info@amtob.org.bd
ওয়েবসাইট : www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত
সম্পাদক : লে. কর্নেল মোহম্মদ জুলফিকার (অব.)
মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : connexion@amtob.org.bd